নেহেরু বাল পুস্তকালয়

ডাকটিকিটের মজার কাহিনী

নেহেরু বাল পুস্তকালয়—24

ডাকটিকিটের মজার কাহিনী

সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদক
নিতাই চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

1975 (*Saka* 1897)
Reprinted 1977 (*Saka* 1899)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)

ROMANCE OF POSTAGE STAMPS (*Bengali*)

প্রচ্ছদপট
চিরন্জিত লাল

Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area, Delhi-110032

ডাকটিকিটের মজার কাহিনী

১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী। সন্ধ্যাবেলা। রূপোর মত সাদা ও লাল রঙের একটা উড়োজাহাজ বোয়িং ৭০৭ নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন বিমানবন্দরে এসে থামল। পত্রপত্রিকার সংবাদদাতারা, সংবাদচিত্রের আলোকশিল্পীরা ও আরো অনেকে উড়োজাহাজটা ঘিরে ফেললেন, চোখেমুখে তাঁদের উত্তেজনা যেন ফেটে পড়ছে। মিঃ ফিনবার কেনি উড়োজাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। হাতে তাঁর 'এক সেণ্ট' দামের ব্রিটিশ গিনির ডাক-টিকিট। 'এক সেণ্ট' দামের ডাকটিকিটটা ইন্সিওর করা হয়েছে দু লক্ষ পাউণ্ডে অর্থাৎ কিনা ছত্রিশ লক্ষ টাকায়। সঙ্গে একজন 'দেহরক্ষী' এটা

নিয়ে এসেছে। লণ্ডনের ষ্টানলি গিবন্‌স্ ক্যাটালগ সেন্টিনারী একজিবিশনে এটা দেখানো হবে।

পরের দিন সকালবেলা এই ডাকটিকিট নিয়েই সবায়ের জল্পনাকল্পনা। এরই কথা সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হোল। বি বি সি থেকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ডাকটিকিট নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার করা হোল। এই কালো ও ম্যাজেন্টা রঙের এক টুকরো কাগজের মধ্যে এমন কি ছিল? ডাকটিকিটের কাহিনী এই জন্যেই তো এতো মজার।

তখনকার দিনে ব্রিটিশ গিনির ডাকটিকিট ছাপতো এক ব্রিটিশ ছাপাখানা। নাম ওয়াটারলো এ্যাণ্ড সন্স। ১৮৫৬ সালে ডাকটিকিট যা ছাপানো হয়েছিলো তা শেষ হয়ে যায়। ডাকটিকিট দরকার। সময়মত নতুন ডাকটিকিট ছেপে এলো না। মহামুস্কিলে পড়লেন ডাকঘরের বড়কর্তা। সেখানকারই এক ছাপাখানা থেকে ৪ সেণ্ট দামের ডাকটিকিট তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে নিলেন। আগেকার ছাপানো ডাকটিকিটের ডিজাইন থেকে এটা ছাপা হোল। ডিজাইনে উপনিবেশের শীলমোহর ছিলো, আর ছিলো একটা জাহাজের ছবি ও একটা শ্লোগান: "দেমাস পেতিমাস্ক ভিসিস্সিম"। এর মানে: আমরা দিই ও পরিবর্তে পেতে চাই। ডাকটিকিট ছাপা হোল ম্যাজেন্টা কাগজে, লালের সঙ্গে অল্প বেগনী আভা মেশানো কালো কালিতে। ছাপা এতো খারাপ হোল যে সহজেই ডাকটিকিট জাল করা যায়। তাই সাবধান হওয়া দরকার। পোষ্ট মাষ্টারমশাই ডাকবিভাগের সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে ডাকটিকিট বিক্রির সময় যে বিক্রি করছে সে যেন নিজের নামের আদি অক্ষর সই করে দেয়।

সতেরো বছর পরের কথা। ব্রিটিশ গিনির এক বাসিন্দা, বয়সে তরুণ, নাম এল ভার্ণন ভঘান। বাড়ীর পুরোনো চিঠিপত্রের গোছা থেকে ঐ ডিজাইনের 'এক-সেণ্টে'র একটা ডাকটিকিট খুঁজে পেলেন। তাতে

ছোট্ট একটা সই, ই. ডি. উইট-এর। ভঘান সবেমাত্র তখন ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে সুরু করেছেন। তিনি জানতেন না যে এই 'চার সেন্ট' দামের ডাকটিকিটের একটাতে ভুল করে 'এক সেন্ট' ছাপা আছে। জলে ভিজিয়ে ডাকটিকিটটা কাগজ থেকে টেনে আলাদা করে নিয়ে নিজের এ্যালবামে রেখে দিলেন। তাতে আরো অনেক রকমের ডাকটিকিট ছিলো। এই ডাকটিকিটটা অষ্ট-ভুজের মত করে কাটা ছিল। ছাপাও পরিষ্কার ছিলো না। আরও ভালো ভালো বিদেশী ডাকটিকিট কেনার কথা ভেবে ভঘান এটা বিক্রি করবেন বলে ঠিক করলেন। এখানেই মিষ্টার এন. আর. ম্যাক্‌কিনন বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরও ডাকটিকিট জোগাড় করে বেড়ানো নেশা। অনেক বুঝিয়ে ভঘান তাঁকে ঐ ডাকটিকিটটা কিনতে রাজী করালেন। রফা হোল ছ শিলিঙে অর্থাৎ পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সায়। ভঘান স্বপ্নেও ভাবেননি যে এই ডাকটিকিট যা তিনি সেদিন মাত্র ছ' শিলিঙে বিক্রি করেছিলেন তা একদিন অমূল্য হয়ে উঠবে।

এর পাঁচ বছর পরে এই ডাকটিকিট আবার বিক্রি হোল। লিভারপুলে টমাস্ রিডপাথ নামে এক ভদ্রলোক একশো কুড়ি পাউণ্ড অর্থাৎ দু হাজার একশো ষাট টাকায় এটি কিনে নিলেন। তিনি এটি আবার বিক্রি করে দিলেন। ফরাসীর নামকরা ডাকটিকিট সংগ্রহকারী ফিলিপ লা রোনো-তিয়ের ভন ফেরারী এটি একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থাৎ দু হাজার সাতশো টাকায় কিনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ডাকটিকিটের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ১৯১৭ সালে মিষ্টার ফেরারী মারা গেলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি প্যারিসে নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। ১৯২২ সালের এক নিলামে এই 'এক সেন্ট' ব্রিটিশ গিনি ডাকটিকিটের দর উঠলো সাত হাজার তিনশো তেতাল্লিশ পাউণ্ড অর্থাৎ এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা। কিনে নিলেন মার্কিন এক ভদ্রলোক, নাম আর্থার হিণ্ড।

আর্থার হিণ্ড মারা যান ১৯৩৩ সালে। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে এই ডাকটিকিটটাও ছিলো। তাঁর বিধবা স্ত্রী দাবী করলেন যে তাঁর স্বামী তাঁকেই এই 'এক সেন্ট'

দামের ডাকটিকিটটা দিয়ে গেছেন। মামলায় তিনি জিতে গেলেন। ১৯৪০ সালে অষ্ট্রেলিয়ার এক ডাকটিকিট সংগ্রহকারী এটি চল্লিশ হাজার ডলার অর্থাৎ তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। নিজের নাম কাউকে জানালেন না।

১৯৬৫ সালে এই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই মিষ্টার কেনি এটি লণ্ডনে গিবন্‌স্ প্রদর্শনীর জন্যে আনেন। ১৯৭০ সালে নিউ ইয়র্কে এটাকে আবার নিলামে চড়ানো হোল। নিলাম ঘর লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের জায়গা নেই। নিলামের ডাক ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। নিলামে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, চোখে তাঁদের বিস্ময়ের ভাব, থেকে থেকে একটা গুঞ্জন-ধ্বনি। চকিত নিঃশ্বাসের একটা শব্দও শোনা যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত 'এক সেণ্ট' দামের ব্রিটিশ গিনি ডাকটিকিট বিক্রি হোল দু লক্ষ আশী হাজার ডলারে অর্থাৎ একুশ লক্ষ টাকায়।

পৃথিবীর দুর্লভ ডাকটিকিটের মধ্যে এই ডাকটিকিটও এক অমূল্য বস্তু। পরে এই ডাকটিকিটের দাম কি দাঁড়াবে তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো।

বিশ্বের নামকরা ডাকটিকিট মরিসাস 'পোষ্ট অফিস'-এর কাহিনীও এই রকম চিত্তাকর্ষক। ভারত মহাসাগরের একটি ছোট্ট দ্বীপ এই মরিসাস। পৃথিবীর মধ্যে ডাকটিকিট প্রচলন করার ব্যাপারে এটিই পঞ্চম দেশ। মরিসাস ডাকটিকিট প্রথম চালু হয় ১৮৪৭ সালে। সর্বপ্রথম ১ পেনি ও ২ পেন্স দামের টিকিট বের করা হয়। ঠিক এই সময় মরিসাসের রাজ্যপালের স্ত্রী লেডী গম মেয়েদের সৌখীন পোষাক বিন্যাসের একটা প্রদর্শনী করবেন ঠিক করেন। এই উপলক্ষ্যে এক নৃত্যানুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন ১৮৪৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। তাঁর ইচ্ছে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠাতে তিনিই প্রথম এই ডাকটিকিট ব্যবহার করবেন। হাতে সময় খুব কম থাকায় সেখানকারই এক ছাপাখানায় ডাকটিকিট ছাপার ব্যবস্থা হয়।

ছোট্ট এই দ্বীপে জে. বার্ণাড বলে এক ভদ্রলোকই শুধু জানতেন কি করে ধাতুর ওপর নক্সা খোদাই করতে হয়। তাঁকে নক্সাটি খোদাই করতে বলা হোল। নক্সাটির মধ্যিখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি, 'ডাকমাশুল' কথাটা লেখা ছিলো সবচেয়ে ওপরে আর 'দাম' সবচেয়ে নীচে। 'মরিসাস'

কথাটা ডাইনে আর 'ডাকমাশুল প্রাপ্ত' কথাটা বাঁয়ে। বার্ণাডকে ১ পেনি ও দু পেন্স দামের ডাকটিকিট ৫০০ করে ছাপতে বলা হোল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে। তিনি নক্সাটি খোদাই করে ডাকটিকিট ছেপে ফেললেন। ভুল করে তিনি 'ডাকমাশুল প্রাপ্ত' (Post Paid) কথাটার জায়গায় 'ডাকঘর' (Post Office) খোদাই করে বসলেন। লোকমুখে জানা যায় যে নক্সাটিতে 'মরিসাস', 'ডাকমাশুল' ও 'দাম' কথাগুলো খোদাই করার পর বার্ণাড যে কাগজটিতে পোষ্টমাষ্টারমশাই লিখে দিয়েছিলেন কি কি কথা খোদাই করতে হবে সেটি হারিয়ে ফেলেন। বাঁয়ে কি কথা খোদাই করার কথা লেখা ছিলো তা তিনি মনে করতে পারলেন না। পোষ্টমাষ্টার-মশাইকে জিজ্ঞেস করতে ছুটলেন। ডাকঘরের কাছাকাছি এসে বার্ণাড ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখেন বাড়ীটার গায়ে 'ডাকঘর' (Post Office) লেখা আছে। ভাবলেন যে এই কথাটাই তিনি খোদাই করতে ভুলে গেছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। এসেই 'ডাকঘর' (Post Office) কথাটা নক্সায় খোদাই করে ফেললেন। ডাকটিকিট ভুল ছাপা হোল। 'ডাকমাশুল প্রাপ্ত' (Post Paid)-র জায়গায় 'ডাকঘর' (Post Office) লেখাটি থেকে গেল।
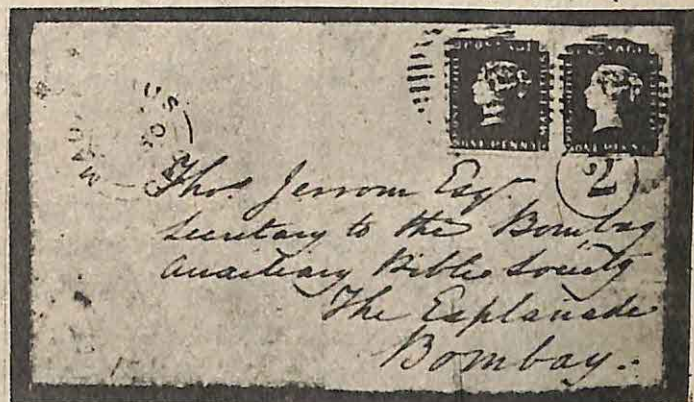
এই ডাকটিকিটের বিক্রি সুরু হোল ১৮৪৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এই ভুলটা কারুর চোখে ধরা পড়েনি। বোর্দো সহরের এক সওদাগরের স্ত্রী মাদাম বোরচার্ড স্বামীকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে এই ধরনের ১২টি ডাকটিকিট দেখতে পান। এই ধরনের ২৬টি ডাকটিকিটের কথা আজ পর্যন্ত জানা গেছে। এর মধ্যে

১৪টি ১ পেনির আর ১২টি ২ পেন্সের। যতবার এগুলো হাত বদলেছে ততবারই এদের দাম বেড়েছে।

এই ডাকটিকিটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা খামে লাগানো ১ পেনি দামের দুটো টিকিট। খামে ঠিকানা ছিলো বোম্বাইয়ের 'থমাস জেরম্'-এর। খামটি ডাকে দেওয়া হয়েছিলো ১৮৫০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী। খামটা ভারতের এক বাজারে পাওয়া যায়। মিষ্টার হাওয়ার্ড বলে এক ভদ্রলোক এটি কিনে নেন পঞ্চাশ পাউণ্ডে অর্থাৎ ন'শো টাকায়। এটি তিনি লণ্ডনে বিক্রি করেন এক হাজার দুশো পাউণ্ডে অর্থাৎ আটাশ হাজার আট শো টাকায়। ১৯০৬ সালে এটি বিক্রি হয় দু হাজার দু শো পাউণ্ডে অর্থাৎ উনচল্লিশ হাজার ছ শো টাকায়। ১৯১৭ সালে মিষ্টার এ. এফ. লিচেনষ্টিন এটি সংগ্রহ করেন। ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে এই নামকরা খামটির মালিক হন। ১৯৬৮ সালে এটি আবার বিক্রি হোল। এবার তিন লক্ষ আশী হাজার ডলার অর্থাৎ আটাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিনলেন নিউ অরলিন্সের রেমণ্ড এইচ্ ওয়েলে কোম্পানী। ভাবলে অবাক হতে হয়! এক টুকরো এই কাগজের এতো দাম হয় কি কোরে!

এগুলোই কিন্তু একমাত্র নামকরা ডাকটিকিট নয়। আরও অনেক ডাকটিকিট আছে যা এই ধরণের ছাপার ভুলের জন্যে বিখ্যাত, দুর্লভও বটে।

তোমাদের মধ্যে যারা ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে চাও, তার জন্যে, কি ভাবে ডাকটিকিটের ব্যবহার চালু হোল, কি ভাবে ডাকটিকিট সংগ্রহ করা প্রথম সুরু হয়, এর কি প্রয়োজনীয়তা, কেমন করে এর থেকে কত কি শেখা যায়, কি ভাবে ও কেমন করে কোন্ কোন্ ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে হবে, ডাকটিকিট ছাপা হয় কেমন করে, এক কথায় ডাকটিকিট বিষয়ে যাবতীয় দরকারী বিষয় নিয়ে, এই বইতে আমি লিখেছি।

ডাকের কথা

ডাকবিভাগের কাজ আজ বাঁধাধরা, এর সুবিধে যে কত তা সবায়েরই জানা। ডাকে চিঠি দেওয়া ও নেওয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ। বহু বছর কিন্তু লেগেছে এই ডাকব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার হতে। ফলে আজ ডাকের সুবিধা অনেক সহজলভ্য হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কিন্তু কোনো ধারণা নেই।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজন থেকেই এই ডাকব্যবস্থার সূচনা। এতে রাজার রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে তার খবর রাখার সুবিধে হোতো। সে যুগে এই ডাকব্যবস্থার সুবিধে শুধু রাজারাজড়াই পেতেন। আজ দেশের সাধারণ একজন নাগরিকও তা পায়।

সর্বপ্রথম চিঠিপত্রের নেওয়া-দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো বার্তাবহদের যাতায়াতের পথ ধরে। শুধু যে ভারতবর্ষেই এ ব্যবস্থা ছিলো তা নয়। মিশর, চীন, গ্রেট ব্রিটেনেও এইভাবেই ডাকবিলি হোত। আজকাল চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের যে ব্যবস্থা তার প্রচুর উন্নতি হয়েছে। চিঠি-পত্র তাড়াতাড়ি ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এখন উড়োজাহাজ, রেল ও মোটরের। ডাকবিলি ব্যবস্থার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হোল ডাক-হরকরা। এরা দূরদূরান্তে ডাক বয়ে নিয়ে যেতো। তখন যানবাহনের কোনো অস্তিত্বও ছিলো না। জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, নদী পেরিয়ে আমাদের চিঠিপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিলো ডাক-হরকরাদের। বাঘ-ভাল্লুক, চোর-ডাকাতের ভয় তুচ্ছ করে এরা ছুটে চলতো।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর আমল থেকেই এই ডাকবিলির ব্যবস্থা চালু হয়। এ ব্যাপারে অশ্বারোহী ও পদাতিক—হুয়েরই সাহায্য নেওয়া হোতো। সৈন্যসামন্তদের অবস্থা, তাদের গতিবিধি ও অগ্রগতির যাবতীয় খবর তিনি এই ডাকব্যবস্থার মারফৎ পেতেন। শের শাহের আমলে এই ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়। শের শাহ খুব অল্প সময়ই রাজত্ব করেছিলেন। কেবল পাঁচ বছর, ১৫৪১ থেকে ১৫৪৫ পর্যন্ত। এই পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ থেকে সিন্ধুপ্রদেশ অবধি টানা ২০০০ মাইল লম্বা এক রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন। রাস্তার মাঝে মাঝে সরাইখানারও ব্যবস্থা ছিলো। রাজ্যের সমস্ত জায়গায় তিনি অশ্বারোহীর সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। প্রত্যেকটি সরাইতে দুটো করে ঘোড়া হামেহাল মজুত থাকতো। তাড়াহুড়ো করে যে সব খবর পাঠাতে হোতো, তা যাতে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। চলাচল ব্যবস্থার আরও উন্নতি হোলো আকবরের সময়। ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫-এর মধ্যে। তখন ঘোড়া ছাড়াও উটকে এই কাজে লাগানো হোলো। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে মহীশূরের রাজা চিক্কা দেব-এর আমলে রাজ্যের সর্বত্র ডাক বহন ও বিলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু হয়। এটা ১৬৭২ সালের কথা।
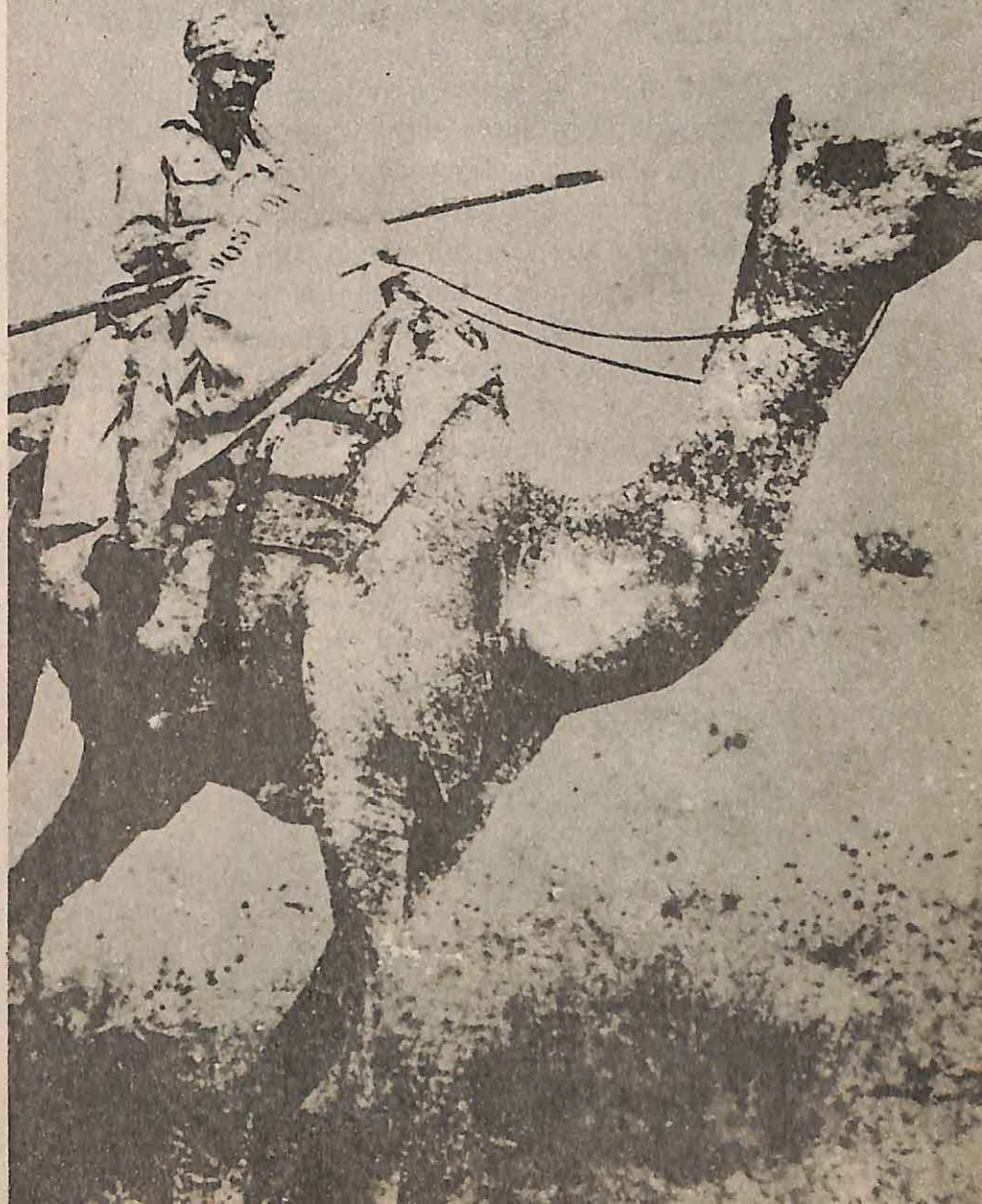
UNPAID

POST PAID

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ডাকব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়। এঁরা এঁদের কাজকারবার চালু করেন ১৬৮৮ নাগাদ, সবপ্রথম মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায়। নিয়মিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই ও মাদ্রাজে বড় ডাকঘর খোলেন। অন্য আরো অনেক জায়গায় চিঠি লেনদেনের জন্যে ছোট ছোট ডাকঘরও খুলে দিলেন। ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভ ডাকব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করলেন। এই সময় এই ডাকব্যবস্থা শুধু একমাত্র সরকারী কাজেই লাগানো হোতো। ১৭৭৪ সালে ডাকব্যবস্থার এইসব সুযোগসুবিধে জনসাধারণও যাতে পায় তার ব্যবস্থা হোলো। এই সময় চিঠির জন্যে সবচেয়ে কম মাশুল ছিলো ১০০ মাইল পিছু ২ আনা করে। ডাকমাশুল দিতে যাতে লোকেদের কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্যে তামার তৈরী ২ আনা দামের এক রকমের মুদ্রা তৈরী হোলো টাঁকশালে।

ডাকঘরে চিঠি দেবার সময়েই ডাকমাশুল দিয়ে দিতে হোত। ডাকমাশুল নগদ দেবার পর চিঠিগুলোর ওপর ষ্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হোত। এই ষ্ট্যাম্পে লেখা থাকতো 'ডাকমাশুল প্রদত্ত' বা 'পুরো ডাকমাশুল প্রদত্ত'। যে সব চিঠির ডাকমাশুল আগে দিয়ে দেওয়া হোত না তাও ডাকঘর নিয়ে নিত। তার ওপরও ষ্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হোত 'Bearing' বা 'Post Not Paid' কিংবা শুধুমাত্র 'Unpaid' কথাটি। এইসব চিঠির ডাকমাশুল আদায় করা হোত চিঠি যার কাছে বিলি হোত। অর্থাৎ যে চিঠিটা গ্রহণ করতো তাকেই ডাকমাশুল দিতে হোত।

সরকারের দেখাশোনার ফলে ডাকব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি খুবই হয়েছিলো। তবুও বেসরকারী লোকেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাক নিয়ে যাওয়া ও বিলি করার ব্যবস্থা চালু রেখেছিলো। সরকারের সঙ্গে এরা সমান তালে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেত।

১৮৩৭ সালে ডাকব্যবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটলো। এই প্রথম 'ডাকঘর-আইন' তৈরী হোলো। ডাকব্যবস্থাকে শুধু বর্তমান সময়ের উপযোগী করে তোলার জন্যেই এই আইন তৈরী হয়নি, সারা ভারত জুড়ে ডাকব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকারও সরকারকে দেওয়া হোলো। এই আইনের মারফৎ বেসরকারী ডাকব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডাকটিকিটের জন্ম

ডাকটিকিট যখন চালু হয়নি তখন চিঠির ডাকমাশুল হয় যে চিঠি পাঠাতো তাকেই আগে নগদ দিয়ে দিতে হোত নয়ত চিঠি যাকে বিলি করা হোত তার কাছ থেকে আদায় করা হোত। যেখান থেকে চিঠি পাঠানো হোত আর যেখানে চিঠি বিলি করা হবে, এই দু-জায়গার দূরত্ব হিসেব করেই ডাকখরচ নেওয়া হোত। চিঠিতে নানান রকমের ছাপ মেরে বোঝানো হোত ডাকমাশুল দেওয়া হয়েছে কিংবা হয়নি। তখনও খামের প্রচলন হয়নি, ডাকে দেওয়া চিঠি শুধু ভাঁজ করে মোড়া হোত। পেছন দিকে ঠিকানা লেখার চল ছিলো। ডাকব্যবস্থার নানান রকম উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর মতন কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা তখনও চালু করা সম্ভব হয়নি।

১৮৩৫ সাল। ইংলণ্ডে করের (ট্যাক্সের) পরিস্থিতি নিয়ে রোল্যাণ্ড হিল পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তিনি দেখলেন ডাকমাশুল বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ডাকবিভাগের আয় কমে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর জানতে পারলেন যে বেশির ভাগ চিঠিই পাঠানো হয় ডাকমাশুল না দিয়ে, তার মধ্যে অধিকাংশ চিঠিই যাদের নামে পাঠানো হয় তারা ফেরৎ দেয়। ডাক-মাশুল দিয়ে তারা চিঠি নেয় না। রোল্যাণ্ড হিলকে একটা মজার গল্প বলা হয়। গল্প হলেও তা সত্যি। আর এই থেকেই বোঝা যায় ডাকব্যবস্থার কি পরিমাণ অপব্যবহার আর অপচয় হোত।

একদিন একটি যুবক রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। এমন সময় পোষ্ট-অফিসের পিয়নকে চিঠি নিয়ে আসতে দেখলেন। অতি সামান্য একজন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে পিয়নটি একটি চিঠি নিয়ে হাজির হোলো। স্ত্রীলোকটির বাস এক দীনহীন কুটীরে। চিঠির ডাকমাশুল দেওয়া হয়নি আগে। তাই স্ত্রীলোকটির কাছে পিয়ন এক শিলিঙ চাইল। কিন্তু স্ত্রী-লোকটি মাথা নেড়ে জানালো যে চিঠি নিতে পারবে না, এমনকি চিঠিটা খুলেও দেখলো না। গরীব ভেবে যুবকটি এগিয়ে এলেন। পিয়নকে এক শিলিঙ দিলেন। স্ত্রীলোকটি প্রতিবাদ জানালো। পিয়ন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বললো, এভাবে টাকা নষ্ট করার মানে হয় না। চিঠিটা খুলে দেখালো। তার মধ্যে শুধু এক টুকরো সাদা কাগজ, কিছু লেখা নেই। যুবকটি হতভম্ব। স্ত্রীলোকটি এবার ব্যাপারটা কি তাই বুঝিয়ে বললো। এটি এসেছে তার ছেলের কাছ থেকে। তার ছেলে এইভাবে একটা সাদা কাগজ ডাকে পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দেয় যে সে ভালো আছে। এতে দু পক্ষেরই কোনো খরচ হয় না।

ডাকমাশুলের হার অত্যন্ত বেশি ছিলো। তাই বহু লোকই ডাক-মাশুল না দিয়ে ডাকব্যবস্থার সুযোগ নেবার চেষ্টা করতো।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিঠি নিয়ে যেতে কি রকম কি খরচ পড়ে, রোল্যাণ্ড হিল তা কষে দেখলেন। লণ্ডন থেকে এডিনবরা অবধি একটি চিঠি নিয়ে যেতে খরচ হয় মাত্র ১ পেনির ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ। ১৮৩৭ সালে 'ডাকঘর সংস্কার' এই নামে একটা বই তিনি ছেপে বার করলেন। তাতে দূরত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না-রেখে সস্তা ও সমান ডাকমাশুলের হার চালু করার কথা আর ডাকমাশুল আগাম দেওয়া বাধ্যতা-মূলক করার ওপর তিনি জোর দেন। তিনি আরও প্রস্তাব করলেন যে 'আগাম ডাকমাশুল দেওয়া হয়েছে' এই ধরনের শব্দ লেখা ছাপা-ডাকটিকিট লাগানো খামও চালু করা হোক। যারা নিজেদের কাগজ, খাম ইত্যাদি ব্যবহার করতে চায় তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা হোল। ছোট ছোট আটা লাগানো ডাকটিকিট কিনে চিঠির ওপর এঁটে দিতে হবে।

দূরত্বের সঙ্গে ডাকমাশুলের কোন সম্পর্ক রইল না। ডাকমাশুলের হার ঠিক করা হোল চিঠির ওজন অনুসারে। আধ আউন্স ওজনের চিঠির জন্যে এক পেনি। আটা-লাগানো ডাকটিকিটের সাহায্যে আগাম ডাকমাশুল দেওয়ার রীতি ১৮৪০ সালের ১০ই জানুয়ারী গ্রেট ব্রিটেনে চালু হোল।

একটা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হোল। 'কিভাবে ডাকটিকিটের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে চালু করা যেতে পারে' সেই বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রস্তাব পাঠাবেন। প্রস্তাব পাঠানোর আগে প্রতিযোগিদের কতকগুলো বিষয়ে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানানো হয়ঃ

১। ডাকটিকিট নাড়াচাড়া করার উপযোগী হওয়া চাই।
২। ডাকটিকিটগুলো যেন কোনোভাবেই জাল করা না যায়।
৩। ডাকঘরে ডাকটিকিটগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা ও তদারক করা যেন সহজ হয়।
৪। ডাকটিকিট ছাপতে ও তার প্রচার বাবদ কত খরচ হবে।

এ ব্যাপারে দু হাজার ছশোর বেশি প্রতিযোগীর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়। একশো পাউণ্ড অর্থাৎ এক হাজার আটশো টাকার চারটে পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু কোনোটাই ডাকটিকিটের জন্য ব্যবহার করা হোল না। রোল্যাণ্ড হিল ও মেসার্স পারকিন্স বেকন এ্যাণ্ড কোম্পানীর মধ্যে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চললো। আলাপ-আলোচনা করার পর ডাকটিকিট ছাপা হোল। এটাই পৃথিবীর প্রথম ডাক-টিকিট—নাম 'পেনি ব্ল্যাক'। চালু হোল ১৮৪০ সালের ৬ই মে।

ব্রাজিলের 'বুলস-আই'

ডাকমাশুল আগাম নেওয়ার ফলে চিঠি বিলির সময় ডাকমাশুল আদায় করার আর কোনো ঝঞ্ঝাটই রইল না। সরকারের

ব্যাসেল ডোভ

জুরিখ

লেডি ম্যাকলিয়ড

রাজস্বের আর ঘাটতি হবার কোনো সম্ভাবনা থাকলো না। ব্রিটেনে ডাকটিকিট নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা ও তার সাফল্যের জন্যে অন্যান্য দেশে ডাকটিকিটের চল খুব সহজ হয়ে এলো। ব্রিটেনের পরই ব্রেজিলে ১৮৪৩ সালে ডাকটিকিটের ব্যবহার চালু হয়। এই বছরেই জুরিখ এবং জেনেভার অন্তর্দেশীয় রাজ্যে ডাকটিকিট চালু হোল। এর পরই বাজেলের শাসনাধীন প্রদেশে ১৮৪৫ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ত্রিনিদাদ এবং মরিসাসে ১৮৪৭ সালে। ১৮৪৯ সালে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্যাভেরিয়ায় ডাকটিকিট চালু হোল। ১৮৫০ সালের পর আরও বহু দেশে ডাকটিকিটের ব্যবহার সুরু হয়।
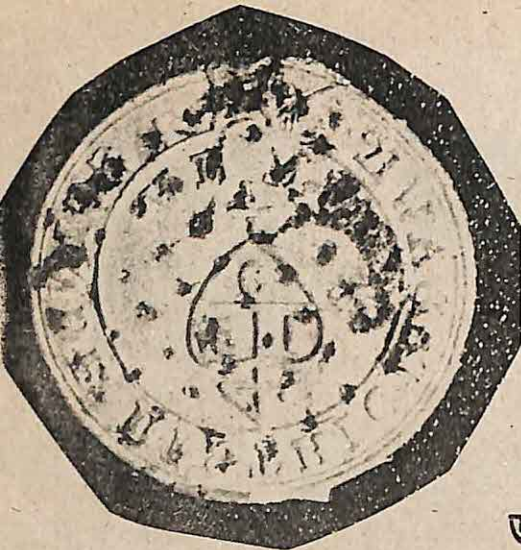
ভারতীয় ডাকটিকিটের ইতিহাস

ভারতে সবপ্রথম সিন্ধুপ্রদেশেই কাগজের ডাকটিকিটের চল হয়। এটা ১৮৫২ সালের কথা। চালু করেন সিন্ধুপ্রদেশের কমিশনার মিষ্টার বার্টল ফ্রেয়ার। আগাম ডাকমাশুল নেওয়ার প্রথাও সুরু হয় এই প্রথম। এই ডাকটিকিটগুলোকে বলা হয় 'সিণ্ডে ডক্স্'। এই ডাকটিকিট শুধু ভারতবর্ষেই নয়, এশিয়াতেও এই প্রথম। এই ডাকটিকিটের মধ্যের নক্সাটি ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চওড়া তীর। ডাকটিকিটগুলো নানান রঙে ছাপা হয়েছিলো। সিঁদুর রঙের ডাকটিকিটই প্রথম বেরোয়। কিন্তু বেশি দিন চলেনি। কারণ নক্সাটি খোদাই করা হয়েছিলো মড়মড়ে একরকমের কাগজে। এরপর সাদা ডাকটিকিট চালু করা হয়। কিন্তু সাদা কাগজের ওপর খোদায়ের ছাপ ভালো দেখা যায় না। তাই শেষ অবধি এও বাতিল করে সাদা কাগজের ওপর নীল কালিতে ডাকটিকিট ছাপা হয়।

'সিণ্ডে ডক্স্'-র পরই সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন সুরু হয়। প্রথম ডাকটিকিটের নক্সাটি ছিলো কলকাতার টাঁকশালের 'সিংহ ও খেজুর গাছ'। কিন্তু কলকাতার টাঁকশালে যেসব যন্ত্রপাতি ছিলো তাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডাকটিকিট পাওয়া যাবে না দেখে এটা আর ছাপা হয় নি।

এরপর ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন থুইলিয়ার ডাকটিকিট ছাপার কাজ হাতে নিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় ১৮৫৪ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট ছাপা হোলো। এই ডাকটিকিট ছিলো আধ আনা দামের, রঙ নীল। এতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাপা ছিলো। পরে এক আনা, দু আনা ও চার আনার ডাকটিকিটও ছাপা হয়। ডাকটিকিটগুলো "লিথোগ্রাফী" অর্থাৎ নক্সা পাথরে খোদাই করে তা থেকে কাগজে ছাপবার যে রীতি তারই সাহায্য নিয়ে ছাপা হয়।

আধ আনা দামের এই ডাকটিকিট নীল রঙে ছাপার আগে লাল রঙেও ছাপা হয়েছিলো মাত্র নশো কাগজে। এই লাল ডাকটিকিটের ধারের নক্সাটা ছিলো কিছুটা আলাদা ধরনের। এই ডাকটিকিট পরে আর ছাপা সম্ভব হয়নি। বিদেশী এই লাল কালি ফুরিয়ে যায়। তাই লাল কালিতে যত টিকিট ছাপা হয়েছিলো সবই নষ্ট করে ফেলা হয়। লাল কালিতে ছাপা এই ডাকটিকিটের একটি আমাদের জাতীয় ডাকটিকিট সংগ্রহশালায় আছে। এই আধ আনা দামের লাল ডাকটিকিট শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। এই ডাকটিকিট '৯½ আর্চ' নামেই পরিচিত। ক্যাপ্টেন থুইলিয়ারের ছাপা এই ডাকটিকিটের উল্টো পিঠে আঠা-লাগানো ছিলো না। এর চারিধারে perforation অর্থাৎ ছোট ছোট কোনো ফুটোও ছিলো না, যার

সাহায্যে একটা ডাকটিকিটকে অন্য আর একটা থেকে আলাদা করা যায়।

১৮৫৬ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত ভারতের ডাকটিকিট ছাপার ভার দেওয়া হয় লণ্ডনের মেসার্স টমাস ছ লা রু এ্যাণ্ড কোম্পানীকে। রাজা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকটিকিটের নক্সা বদলাতে লাগল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পর সপ্তম এডওয়ার্ড, তারপর পঞ্চম জর্জ, পঞ্চম জর্জের পর ষষ্ঠ জর্জের ছবি ছাপা হোল। ভিন্ন ভিন্ন দামের টিকিট বিভিন্ন রঙে। ১৯২৬ সালে নাসিকে এক সরকারী প্রেস খোলা হোল। নাম দেওয়া হয় ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেস। ডাকটিকিট ছাপার যাবতীয় দায়িত্ব পড়লো এই ছাপাখানার ওপর।

১৯৩১ সালে দিল্লীর উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষ্যে নতুন ডাকটিকিট ছাপা হোল। এই প্রথম ডাকটিকিটে রাজার ছবি ছাড়াও দৃশ্যের ছবি ছাপা হয়। এটাকেই প্রথম সচিত্র ভারতীয় ডাকটিকিট বলা যেতে পারে। এতে দিল্লীর নানারকম দৃশ্য ও নামকরা সব জায়গার ছবি ছাপা হোল। এরপর বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সেই সেই উপলক্ষ্যে ডাকটিকিট ছাপা সুরু হয়। ১৯৩৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়। এই রজত-জয়ন্তী উৎসবে নতুন ডাকটিকিট বেরুলো। ১৯৩৭ সালে ডাকবহনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি ছেপে ডাকটিকিট বাজারে ছাড়া হোল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে চারটে বিশেষ ধরনের ডাকটিকিট ছাপা হয় ১৯৪৬ সালে।

ভারত স্বাধীন হবার পর বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু রকমের স্মারক-ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। এতে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এইসব ডাকটিকিটে আমাদের

দেশের বন্য জীবজন্তু, বিভিন্ন ধর্ম, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নানান দিক স্থান পেয়েছে। প্রাচীন স্থপতিবিদ্যা, ঐতিহাসিক ঘটনা, এমন কি মাউণ্ট এভারেষ্টের বিজয়ও বাদ পড়েনি। শিশুদের জন্যে সামাজিক ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনার কথাও এতে আছে। এই-সব ডাকটিকিটে দেশের নেতাদের, স্বাধী-নতা-সংগ্রামীদের, দার্শনিক ও চিন্তা-বিদ্‌দের, শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিকদের, লেখক ও শিল্পীদের ছবিও ছাপা হয়েছে। এইভাবে এইসব মহামানবদের সম্মান দেখানো হয়েছে। ডাকটিকিট আরও রঙচঙে ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে নানান রঙে ছাপার একটা মেসিন ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে বসানো হয়েছে। এবার ভারতে নানা বিষয়ের রঙবেরঙের ডাকটিকিট ছাপা হবে।

ভারতের মুখোশ, ভারতীয় লঘুচিত্রের প্রতিলিপি ও ভারতবর্ষের নাচের বিচিত্র ভঙ্গী নিয়ে ডাকটিকিটের সিরিজ ছেপে বার করা হবে। ভারতের ডাকটিকিটের
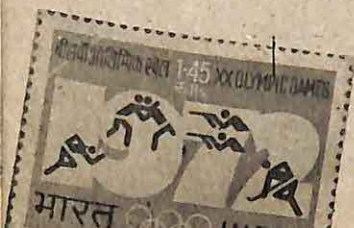
ইতিহাসে এ হবে এক স্মরণীয় ঘটনা। ভারতীয় ডাকটিকিটের ইতিহাসে মনে রাখবার মতো আরও দুটি ঘটনা আছে। প্রথমটি উড়োজাহাজ নিয়ে ডাক-টিকিটের সিরিজ। কমনওয়েলথ্ দেশ-গুলোর মধ্যে ভারতবর্ষই প্রথম এই ধরণের সিরিজ চালু করে। এটা ১৯২৯ সালের কথা। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ সালে ৬,৫০০ চিঠি ও পোষ্টকার্ড উড়োজাহাজ করে এলাহাবাদ থেকে নৈনী নিয়ে যাওয়া হয় বিলি করতে। উড়োজাহাজ করে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই প্রথম হয়।

উড়োজাহাজের মধ্যে এম. পিকোয়ে। এই উড়োজাহাজ করেই ১৯১১ সালে প্রথম ডাক নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁদিকে ওপরে ঐ উড়োজাহাজে করে নিয়ে-যাওয়া চিঠিপত্রের ওপর ডাকঘরের শীলমোহর লাগানোর ছাপ।
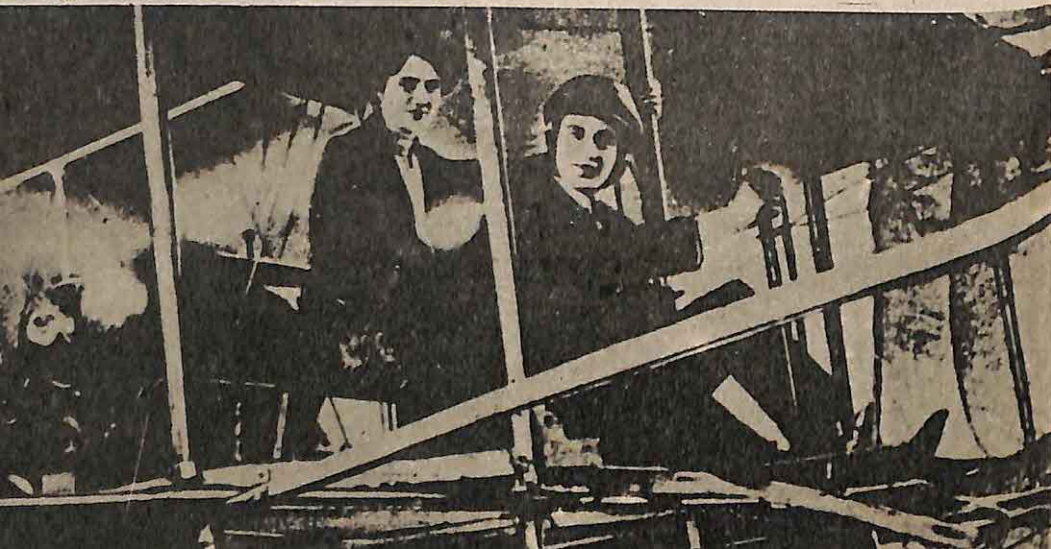
ডাকটিকিট সংগ্রহ

ডাকটিকিট সংগ্রহের সবচেয়ে পুরোনো কাহিনী হোল এক তরুণীর। তাঁর এক অদ্ভুত সখ ছিলো। ব্যবহার-করা পুরোনো ডাকটিকিট জমানো। আর তাই দিয়ে সাজঘর মুড়ে রাখার বাতিক। একাই তিনি ১৬,০০০ ডাকটিকিট জোগাড় করেন। ১৮৪১ সালে লণ্ডন টাইম্‌স্‌ পত্রিকার পাঠকদের অনুরোধ জানিয়ে তিনি এক বিজ্ঞাপন দেন। অনুরোধ তাঁকে যেন আরও ডাকটিকিট পাঠানো হয়। ডাকটিকিট চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকটিকিট সংগ্রহের পাগলামি আর নেশা ছিলো খুব বেশি। এলোমেলো ভাবে ডাকটিকিট জোগাড় করার এই পাগলামি কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসে। সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে ডাকটিকিট সংগ্রহ সুরু হয়। এই ডাকটিকিট সংগ্রহের নাম 'ফিলাটেলী'। কথাটা দুটো গ্রীক শব্দ নিয়ে— 'ফিলোজ' মানে 'অনুরাগী' আর 'এ্যাটেলেস' মানে 'কর থেকে মুক্তি'।

ডাকটিকিট সংগ্রহের এই নেশা আজ সারা পৃথিবী জুড়ে। শুধু ডাক-টিকিটের দামের জন্যেই লোকে তা সংগ্রহ করে না। ডাকটিকিটের ওপর কত সুন্দর সুন্দর ছবিই না ছাপা হয়, কতশত কাহিনীই না থাকে এই সব ছবির মধ্যে। কত বিচিত্র ঘটনাকেই না কেন্দ্র করে এইসব ছবি ছাপা হয়। ডাকটিকিট দেখেই বোঝা যায় এগুলো কি ভাবে ছাপা হয়েছে। এককথায় ডাকটিকিট হোল 'জাতির বাতায়ন-পথ যার মধ্যে দিয়ে সাগরপারের বাসিন্দারা নিজেদের জীবনধারা, ঐতিহ্য ও প্রকৃতিকে মেলে ধরে'। একটা জাতির জীবনের প্রতিটি দিক, তার ব্যবসা, তার বাণিজ্য, তার ইতিহাস,

শিল্প, কারুকলা, তার প্রাকৃতিক ইতিহাস, সব কিছুই প্রতিভাত হয় এই ডাকটিকিটে।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করাটা এখন শুধু সখ নয়, রীতিমত গভীর অধ্যয়নের বিষয়। ডাকটিকিট যারা সংগ্রহ করে তারা এখন নিয়মিত দেশবিদেশের ভূগোল, ইতিহাস পড়ে, প্রাকৃতিক জীবন নিয়ে রীতিমত চর্চা করে। ডাক-টিকিটের এ্যালবাম তাই এখন জ্ঞানের ভাণ্ডার। মৌলিক গবেষণার কাজে লাগতে পারে।

কি সংগ্রহ করতে হবে

ডাকটিকিট সংগ্রহ যারা করতে চায় তাদের কাছে দুটো সমস্যা দেখা দেয়। এক 'কি সংগ্রহ করতে হবে' আর দুই 'কেমন করে সংগ্রহ করতে হবে'। একশো বছর আগে সারা পৃথিবীর সব ডাকটিকিট পুরোপুরি সংগ্রহ করা যে কোনো সংগ্রহকারীর পক্ষে সহজ ছিলো। কিন্তু ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারটা যত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো তত সমস্ত দেশই এই ডাকটিকিটের মধ্যে দিয়ে তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প, নানান প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রগতি ও অগ্রগতির কথা প্রচার করতে সুরু করলো।

এমন কোনো বিষয় বা প্রসঙ্গ নেই যা ডাকটিকিটে ছাপা হয়নি। জনপ্রিয় বিষয় হোলো বিমানডাক, শিল্পকলা, পাখী, প্রজাপতি, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, মাছ, নামকরা পুরুষ ও মহিলা, ফুল, ভেষজতত্ত্ব, পেন্টিংস, ইতিহাস, রেলের কথা, ধর্মতত্ত্ব, স্কাউট, মহাশূন্যের বিচিত্র তথ্য, খেলাধুলো, জাহাজ।

এইসব বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ১,৮০,০০০ হাজারের বেশি ডাক-টিকিট বেরিয়েছে। ৬০০০ থেকে ৭০০০ রকমের নতুন ডাকটিকিট প্রতি বছরে বেরোয়। তাই ছুনিয়ার মোটামুটি সব রকমের ডাকটিকিট সংগ্রহ করা আজ একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলে সংগ্রহকারীরা বিশেষ বিশেষ বিষয় বেছে নেওয়ার অথবা নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা অঞ্চলের ডাকটিকিট সংগ্রহ করার ওপর জোর দিতে সুরু করেছে। বলতে কি, গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ডাক-টিকিট সংগ্রহ করাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একটা কারণ এও হতে পারে যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ডাকটিকিট সংগ্রহের আবেদন আজ অনেক বেড়েছে। যার যে বিষয়ে যত বেশি আগ্রহ সে সেই বিষয় নিয়েই সংগ্রহ সুরু করতে পারে। ভবিষ্যতে সেই-ই একদিন সেই বিষয়বস্তুর বিশেষ নামকরা সংগ্রাহক হয়ে উঠবে। বিষয়গুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে হয়। যেমন ধরো, পাখীর ছবিওয়ালা ডাকটিকিট। এই ডাকটিকিট-গুলোকে আবার নানান ভাগে ভাগ করতে পারা যায়ঃ যেমন, ডাঙ্গার পাখী, সমুদ্রের পাখী, শিকার করা হয় যেসব পাখী অথবা শিকারী পাখী।

তাই ডাকটিকিট সংগ্রহ করার আগেই ঠিক করে নিতে হবে কি কি সংগ্রহ করবে। যে বিষয়ই ঠিক কর না কেন, নজর রাখতে হবে সংগ্রহ যেন সম্পূর্ণ হয়। এলোপাতাড়ি জোগাড় করাটা এড়িয়ে যেতে হবে। সংগ্রহের কাজ সুরু করার আগেই একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে নিতে হয়। তা না হলে অল্প দিনের মধ্যেই তোমার উৎসাহে ভাঁটা পড়বে।

তোমার যা ভালো লাগে সেইরকম একটা বিষয় বেছে নাও। খুব সহজে জোগাড় করা যায় এমন সব ডাকটিকিট দিয়েই কাজ আরম্ভ করো।

'স্বাধীনতার পর ভারতের ডাকটিকিট' যেসব বেরিয়েছে তা দিয়েই কাজ সুরু করা সহজ হবে।

কি করে সংগ্রহ করতে হবে

প্রথমে শুধু ডাকটিকিট জমাতে আরম্ভ করো। প্রচুর ডাকটিকিট পাবে। বন্ধুদের কাছ থেকে কিংবা অফিস থেকে। বাড়ীতে যে সব চিঠিপত্র আসে তার তাড়া হাতড়ালেও অনেক পাবে। খাম থেকে ডাকটিকিট টেনে তোলার চেষ্টা করবে না। খামের যেখানে ডাকটিকিটটা লাগানো আছে সেই জায়গার কাগজটুকু কেটে নাও। কাটবার সময় খেয়াল রাখবে যেন চারিধারে খানিকটা খালি জায়গা থাকে। যেসব দোকানে ডাকটিকিট বিক্রি হয় সেখান থেকেও ডাকটিকিটের ছোট প্যাকেট কিনতে পারো। এইসব ডাকটিকিটও কিন্তু ব্যবহার করা, খাম থেকে খুলে নেওয়া। দেখবে তোমার স্কুলের বন্ধুরা ডাকটিকিট বদলাবদলি করার জন্যে ব্যস্ত। তোমার কাছে একই ধরনের ডাকটিকিট যা দুটো করে আছে, সেগুলো তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বদল করে নিতে পারো।

তোমার কাছে এখন তোমার পছন্দ-করা ডাকটিকিটের বেশ একটা তাড়া হয়েছে। ভাবছো, এগুলো ঠিক ভাবে কোথায় তুমি সাজিয়ে রাখবে? ঘাবড়ে যেও না, এ্যালবাম দেখেছো? বাজারে অনেক রকমের এ্যালবাম পাবে—নানান বিষয়ের ওপর নানান ধরনের। দামও তার নানারকমের। নানারকম ছবিতে ভরা—এগুলো তোমায় ডাকটিকিট চেনায় সাহায্য করবে। তোমাদের মধ্যে যারা সবেমাত্র

ডাকটিকিট সংগ্রহের কাজ সুরু করেছো তাদের পক্ষে পাতার দু'পিঠেই ডাকটিকিট লাগানো যায় এমন এ্যালবাম কেনাই ভালো। এই ধরনের এ্যালবামে একটা অসুবিধেও আছে। এ্যালবাম খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকটিকিটগুলো পাতা থেকে উঠে আসার আশঙ্কা থাকে। ছিঁড়ে যাওয়ার বা খারাপ হবার ভয়ও আছে। প্রত্যেকটা পাতা আলাদাভাবে খুলে নেওয়া যায়, এমন এ্যালবামই ভালো। এখন ডাকটিকিটের একটা ক্যাটালগ দরকার। এও কিনতে পাবে। এতে ডাকটিকিটের বিশদ বিবরণও পাবে। এছাড়া, প্রত্যেক বিষয়ে কতগুলো করে ডাকটিকিট বেরিয়েছে তাও জানতে পারবে। এবার তুমি ঠিক ঠিক জায়গায় ডাকটিকিটগুলো ঠিকমত লাগাতে পারবে।

ডাকটিকিট লাগানো

ডাকটিকিট লাগানোর কাজ সুরু করার আগে এক প্যাকেট ষ্ট্যাম্প লাগাবার 'হিঞ্জ' (কব্জার মত জিনিষ) ও একটা সন্না কিনে নেবে।

ডাকটিকিট লাগাতে কখনও শিরিষের আঠা, লেই কিংবা আঠামাখানো ফিতে যাকে 'সেলোটেপ' বলে তা ব্যবহার করবে না। তাতে টিকিটগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার দরকার এক প্যাকেট 'হিঞ্জ'। এ হোলো একরকমের খুব পাতলা অথচ শক্ত কাগজের ছোট ছোট সমকোণী চতুর্ভুজ। পেছনে পুরু করে গঁদ লাগানো থাকে। শুকনো অবস্থায় ডাকটিকিটের পেছন থেকে বা এ্যালবামের পাতা থেকে এগুলো খুব সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায়। এতে ডাকটিকিটের কোনো ক্ষতি হয় না। 'হিঞ্জে'র দামও বেশি নয়। তাই দেখেশুনে একটু ভালো জিনিষই কিনবে। 'হিঞ্জ' ফালি হিসেবে পাওয়া যায়, এক পিঠে গঁদ লাগানো ও ফ্ল্যাট। ব্যবহার করার সময় এগুলো ভাঁজ করে নিতে হয়। যেদিকটায় গঁদ লাগানো সেদিকটা বাইরের দিকে রাখবে। মাঝখানে কিন্তু ভাঁজ হবে না। এমনভাবে ভাঁজ করো যেন একটা অন্য ভাঁজের চেয়ে বড় হয়।

ছোট দিকটা লাগানো থাকবে ডাকটিকিটের সঙ্গে আর বড় দিকটা এ্যালবামে।

ডাকটিকিটের জন্যে সন্না ব্যবহার করতে হবে। বুড়ো আঙ্গুল বা অন্য আঙ্গুল দিয়ে ডাকটিকিট লাগাবে না। এতে টিকিট ময়লা বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সন্নার দরকার। সন্নায় যেন মরচে না থাকে। খুব ধারালোও যেন না হয়, খেয়াল রাখবে। প্রথম প্রথম সন্না ব্যবহার করতে একটু অসুবিধে হবে। ঘাবড়ে যেও না। দু-চার দিনের মধ্যেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে।

সবকিছুই এখন জোগাড় হয়ে গেছে। এ্যালবাম আর সন্না নিয়ে কাজ সুরু করতে হবে। ব্যবহার-করা ডাকটিকিটগুলো কাগজে লাগানো আছে। টিকিটগুলোকে আলাদা করতে হবে, পুরোনো গঁদের আঠাও ধুয়ে তুলে ফেলতে হবে। ডাকটিকিটগুলো এক এক করে সাজিয়ে নাও। যেগুলো খারাপ মনে হবে, ফেলে দাও। যেসব ডাকটিকিট ছিঁড়ে গেছে বা কোণগুলো কেটে গেছে কিংবা চারপাশের ফুটোগুলো যার নেই বা যার ওপর ডাকঘরের শীল মোহরের ছাপ অনেকবার পড়েছে, সে সব টিকিট বাতিল করো। এতোগুলো জমানো ডাকটিকিট ফেলে দিতে তোমার মন কেমন করবে। কিন্তু এটা করতে 'কিন্তু' করো না, বুঝলে। তা না হলে ডাকটিকিটের ভালো সংগ্রহ তুমি করতে পারবে না।

এইবার একটা জায়গাতে ঠাণ্ডা জল নাও। ভাল ডাকটিকিট সব এতে ডুবিয়ে দাও। ভিজে গিয়ে ডাকটিকিটগুলো পাত্রের তলায় চলে যাবে। এবার খুব সাবধানে আস্তে আস্তে কাগজ থেকে ডাকটিকিটগুলো একটা
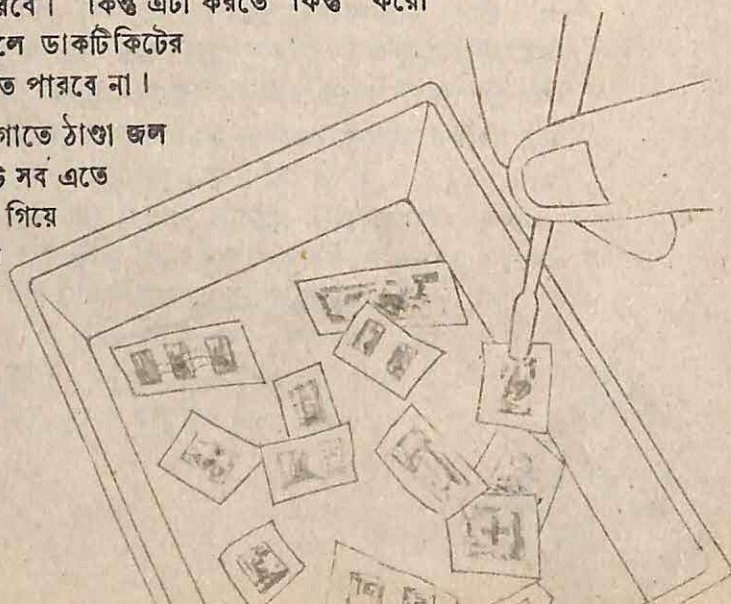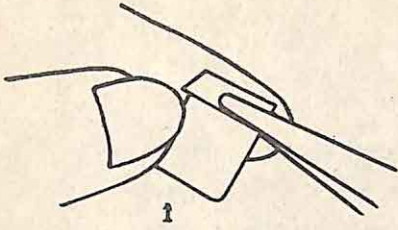
১। 'হিঞ্জ' কিভাবে ভাঁজ করা হয়
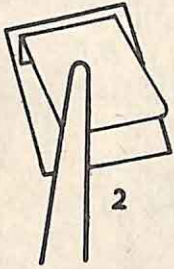
২। ভাঁজ-করা 'হিঞ্জ' কিভাবে ডাক-টিকিটের পেছনে লাগাতে হয়

একটা করে আলাদা করে নাও। সব ডাকটিকিট যেন একসঙ্গে জলে ডুবিয়ে দিও না। এক একবারে অল্প কিছু করে ডাক-টিকিট দাও। বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখো। যাতে ডাকটিকিটগুলো আপনা থেকেই কাগজ থেকে খুলে আসে। জলে
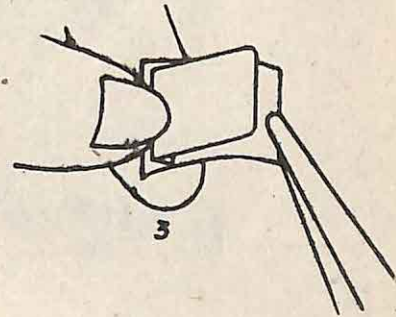
৩ ও ৪। 'হিঞ্জ' লাগানো ডাক-টিকিট কিভাবে এ্যালবামের পাতায় লাগাতে হয়

ভিজে কোনও কোনও টিকিটের ছাপার কালি উঠে যেতে পারে। এইসব ডাকটিকিট সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে তুলে নাও। না হলে ভালো ডাকটিকিটে রঙ লেগে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবে। কাঁচা কালিতে ছাপা ডাকটিকিটগুলো দেখেশুনে আলাদা করে নিতে হয়। এগুলো আলাদা পাত্রে ভেজাবে। কাগজ থেকে যেসব ডাকটিকিট আলাদা হয়ে গেছে সেগুলো সন্না দিয়ে তুলে নাও।
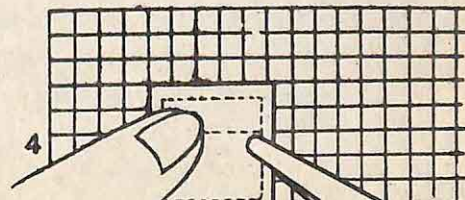
পরিষ্কার একটা কাগজের ওপর ডাকটিকিটগুলো বিছিয়ে দাও। এমনভাবে বিছিয়ে দেবে যাতে ছাপা দিকটা কাগজের ওপর থাকে। শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকটিকিটগুলো কুঁচকে যাবে। শুকিয়ে গেলে সমান করে একটা বইয়ের পাতার ভাঁজে কয়েক ঘণ্টার জন্যে রেখে দাও। দেখবে ডাকটিকিটগুলো সমান হয়ে গেছে।

এইবার ডাকটিকিটগুলো এ্যালবামে লাগাতে হবে। ডাকটিকিটগুলো যেভাবে লাগাতে চাও সেইভাবে এ্যালবামের পাতায় পর পর সাজিয়ে নাও। এইবার 'হিঞ্জ'-এর দরকার। একটা 'হিঞ্জ' ভাঁজ কর। মনে আছে তো—সমান ভাঁজ হলে চলবে না। এক দিকটা তিনভাগের এক
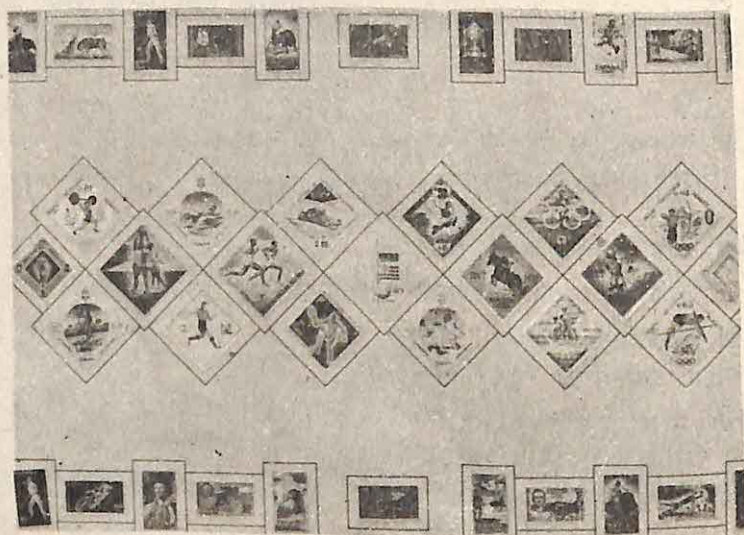
ভাগ কিংবা চার ভাগের এক ভাগ ছোট হবে। টিকিটের পেছনে ছোট দিকটা লাগাও। খেয়াল রেখো একেবারে ওপরে লাগাতে হবে, ঠিক ছোট ছোট ফুটোগুলোর নীচে। 'হিঞ্জ' লাগাবার সময় খুব বেশি জল লাগাবে না। বিশেষ করে নতুন ডাকটিকিট যা ব্যবহার করা হয়নি।

2500th BUDDHA JAYANTI

COLOUR TRIALS

PHOTOPROOFS

FINISHED STAMPS

THE UMBRELLA WHICH ONCE SURMOUNTED A COLOSSAL BODHISATTVA
THE ROUND FIGURE ON THE LEFT IS A REPLICA OF THE KUSHAN KING KANISHKA (FIRST-SECOND CENTURY A.D) THE UMBRELLA
STATUE AT SARNATH, CARVED IN THE REIGN OF THE CONCENTRIC DECORATIVE BANDS. THE PIERCED PROJECTING PORTION AT THE
IS 10 FT. IN DIAMETER AND IS ADORNED WITH CONCENTRIC THE LOTUS-PETALS CONTAINS A ROW OF TWELVE MYTHICAL ANI
CENTRE HAS THE SHAPE OF A LOTUS. THE RING BEYOND THE BROKEN VIZ. THE THREE JEWELS, A PAIR OF FISH, A
MALS. THE NEXT BAND HAS ELEVEN SYMBOLS BESIDES ONE BROKEN A VASE WITH FRUITS (OR SWEETS) A CUP OF LEAVES &
FLEUR DE LIS. A VASE WITH FOLIAGE, A CONCH, A SWASTIKA, A OF LOTUS-PETALS BORDERING THE UMBRELLA. ON THE RIGHT
THREE HONEYSUCKLES. THE OUTERMOST BAND IS MADE OF
IS SHOWN A REPRESENTATION OF THE BODHI TREE.

ARTISTS' REPRESENTATION OF THE ASVATTHA TREE (FICUS RELIGIOSA)
AT BODH GAYA SEATED UNDER WHICH GAUTAMA ATTAINED ENLIGHTEN-
MENT. IN BUDDHIST ART THIS TREE SYMBOLIZES THE SUPREME MO-
MENT IN GAUTAMA'S LIFE WHEN HE BECAME THE BUDDHA.
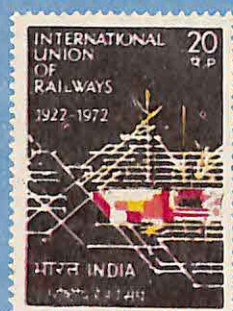
কেন জানো, নতুন ডাকটিকিটের পেছনে যে আঠা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। 'হিঞ্জ'টা এবার ডাকটিকিটের ওপর লাগাও। 'হিঞ্জে'র অন্য দিকটা জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। খুব অল্প একটু জলের হাত দিলেই চলবে। এ্যালবামের যে পাতায় যে জায়গায় ডাকটিকিটটা লাগাতে চাও সেই জায়গায় ডাকটিকিটটা ঠিক করে বসাও। আঙ্গুল দিয়ে এবার ডাকটিকিটটায় একটু চাপ দাও। দেখবে 'হিঞ্জ'টা এ্যালবামের পাতায় চেপটে গেছে।

ডাকটিকিট সাজানো

ডাকটিকিট সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় খেয়াল রাখতে হবে যেন তোমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয়। যে ধরনের ডাকটিকিট তুমি জোগাড় করবে বলে ভেবেছো তার কোনটাই যেন বাদ না যায়। সেই বিষয়ের কোনো ডাকটিকিট জোগাড় না হলে তোমার সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই প্রথমেই তোমায় জানতে হবে তুমি যে বিষয়ের ডাকটিকিট সংগ্রহ করছো সেই বিষয়ের ওপর কত ডাকটিকিট সবশুদ্ধ বেরিয়েছে। এটা তুমি ঐ ক্যাটালগেই পাবে। সব ডাকটিকিট যদি জোগাড় করতে না পেরে থাকো তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ্যালবামের পাতায় সেইসব ডাকটিকিটের জায়গা খালি রাখো। কেন জায়গা ছেড়ে রাখতে বলছি তা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই। পরে যেমন যেমন ডাকটিকিট জোগাড় করবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঐসব খালি জায়গায় সেগুলো লাগিয়ে রাখবে। এটা সবসময় মনে রেখো এলোমেলো ভাবে ডাকটিকিট সাজালে চলবে না। নিয়ম করে পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে পর পর ডাকটিকিট সাজাতে হবে। সুন্দরভাবে ডাক-টিকিটগুলো সাজালে এ্যালবাম দেখতেও সুন্দর হবে, তোমার সংগ্রহের দামও বাড়বে। প্রত্যেকটা ডাকটিকিটের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে। ডাকটিকিটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তৈরীর ব্যাপারটাই সবচেয়ে আনন্দের।

এ্যালবামের পাতাগুলোয় চৌখুপ্পী কাটা আছে দেখবে। এই চৌখুপ্পীর চারদিক সমান। এই ঘর গুণে গুণে, প্রত্যেকটা ডাকটিকিটের মধ্যে কটা ঘর খালি ছেড়ে দেবে তা ঠিক করো প্রথমে। ডাকটিকিট দিয়ে পাতাটা কিভাবে সাজাবে তা এরই ওপর নির্ভর করছে। প্রত্যেক ডাকটিকিটের সংক্ষিপ্ত

পরিচয়ের জন্যে কতটা করে জায়গা ছাড়তে চাও তাও তোমায় এইসঙ্গে ভাবতে হবে। ডাকটিকিটের ওপর যেসব কথা ছাপা থাকে না সেগুলিই তোমায় লিখতে হবে। যেমন, কবে ডাকটিকিটটা বাজারে ছাড়া হয়েছে, কেন এই ডাকটিকিটটা ছেপে বাজারে ছাড়া হোলো, জলছাপটা কার বা কিসের, চারধারে আলপিনের মত কটা ফুটো, কে এঁকেছে ছবিটা, খোদাই কে করেছে, কোন্ ছাপাখানা ছেপেছে, কি কাগজে আর কত ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। এসব কিন্তু খুব ছোট্ট করে লিখতে হবে। এ্যালবামে ডাকটিকিটের এই ধরনের সালতামামী থাকা খুবই দরকার। দেখো, পাতাটা যেন এই লেখাতেই ভরে না যায়। ডাকটিকিটে-ভরা পাতাটার সৌষ্ঠব যেন নষ্ট না হয়। পরিচিতি যদি বড় হয়ে যায় তাহলে আলাদা একটা কাগজে তা লিখে এ্যালবামে লাগিয়ে দেবে। এ্যালবামের পাতা যেন লেখার ভারে ভারী না হয়ে পড়ে। তেমনি আবার শুধু ডাকটিকিটেই যেন ভরে না যায়। ডাকটিকিটের ঠাসাঠাসি বা বড় বড় পরিচিতি, দুই-ই পাতার সৌন্দর্য নষ্ট করে। দুয়েরই সুষ্ঠু সমন্বয় হওয়া চাই। ডাকটিকিট আর তার পরিচয় এই দুয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে এ্যালবামের প্রতিটি পাতা সুন্দর করে সাজাতে হবে।

সাজাবার ছক তৈরী করে এ্যালবামের পাতায় ডাকটিকিটের ও তার পরিচিতি লিখতে যেটুকু জায়গা রাখতে চাও, পেন্সিল দিয়ে আলতো করে তার দাগ দাও। পেন্সিল দিয়ে আলতো করে দাগ দিতে বলছি কেন তা বুঝতেই পারছো। কাজ মিটে গেলেই রবার দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলতে পারবে। ডাকটিকিট লাগাবার আগেই কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচিতিটা সুন্দর করে লিখে নেবে। খুব সরু ছুঁচোলো স্টেন্সিল কলম দিয়ে কালো স্টেন্সিল কালিতে লিখবে। এতে পাতাটাও সুন্দর দেখাবে।
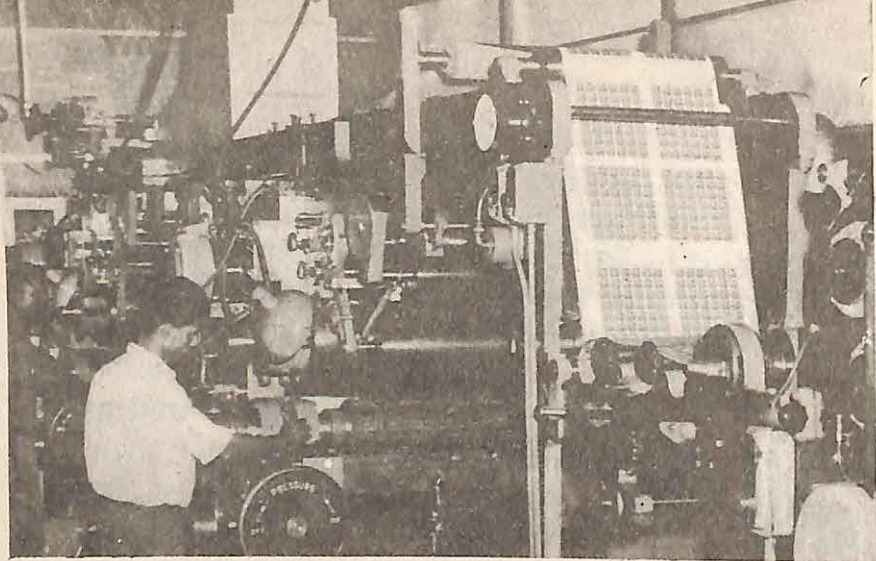
ডাকটিকিট ছাপা

ডাকটিকিট কিভাবে ও কেমন করে ছাপা হয় তা জানার কৌতূহল তোমাদের স্বাভাবিক। কত ভাবে এই ডাকটিকিট ছাপা হয় তার কথা তোমাদের ঐ ক্যাটালগে আছে। টাইপোগ্রাফী, অফসেট লিথোগ্রাফী, ইনটাগলিও ও ফটোগ্রেভিওর সাহায্যে ডাকটিকিট ছাপা হয়। আসলে এগুলো ছাপার বিভিন্ন পদ্ধতি। ছাপাখানায় এইসব ছাপার জন্যে নানা যন্ত্রপাতি থাকে। এদের কলাকৌশল একটু জটিল ধরনের। কিন্তু এদের ছাপার প্রণালী সহজ।

ডাকটিকিট ছাপা হয় চার রকম পদ্ধতিতে :

টাইপোগ্রাফী

নিজের নাম ও ঠিকানা ছাপাতে তোমরা রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করতে দেখেছো নিশ্চয়ই। রবার ষ্ট্যাম্প তৈরী করে তার ছাপ কাগজের ওপর কিভাবে তোলে তাও দেখেছো। রবার ষ্ট্যাম্পে কালি লাগিয়ে সেটা কাগজের ওপর চেপে ধরলেই কাগজে ছাপ পড়ে। ঠিক এইভাবেই টাইপোগ্রাফীতে অক্ষরগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে ছাপা হয়। ডাকটিকিটের নক্সার যে অংশটার ছাপ কাগজের ওপর পড়বে সেই অংশটা সবচেয়ে উঁচু হয়ে থাকে। বাকী অংশ নীচুতে থাকে। ফলে কালি লাগালে যে অংশের ছাপটুকু তোমার দরকার তাতেই কালি লেগে যায়।

এর ওপর কাগজ দিয়ে চাপ দিলেই কাগজে নক্সাটা উঠে আসে। এইভাবে ছাপানোর পদ্ধতিকেই টাইপোগ্রাফী বা লেটারপ্রেস প্রিন্টিং বলা হয়।

লিথোগ্রাফী

একটু বেশি কালি দিয়ে এক টুকরো কাগজে তোমার নামটা লেখো। পেন্সিল বা কালির দাগ ঘষে তুলে ফেলা যায় যে রবারে বা ইরেজারে সেইরকম একটা সাদা নরম ইরেজার নাও। কাগজের কালি শুকিয়ে যাবার আগেই এই ইরেজারটা ঐ লেখার ওপর আস্তে চেপে ধরো। দেখবে তোমার নামটা ইরেজারের গায়ে উল্টোভাবে লেখা হয়ে গেছে। একটুও সময় নষ্ট না করে তক্ষুনি ঐ ইরেজারটা যদি আবার একটা সাদা কাগজের ওপর একটু জোর দিয়ে চেপে ধরো তো দেখবে কাগজে তোমার নামটা আবার সোজা হয়ে ছাপা হয়ে গেছে। ঠিক যেমনটি তুমি গোড়াতে লিখেছিলে। অফসেট লিথোগ্রাফী এ ছাড়া আর কিছু নয়। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে দস্তা বা এ্যালুমিনিয়ম পাতের ওপর যে নক্সাটা ছাপা হবে তার ছাপটা তুলে নেওয়া হয়। এই পাত থেকে কিন্তু সরাসরি কাগজে ছাপা
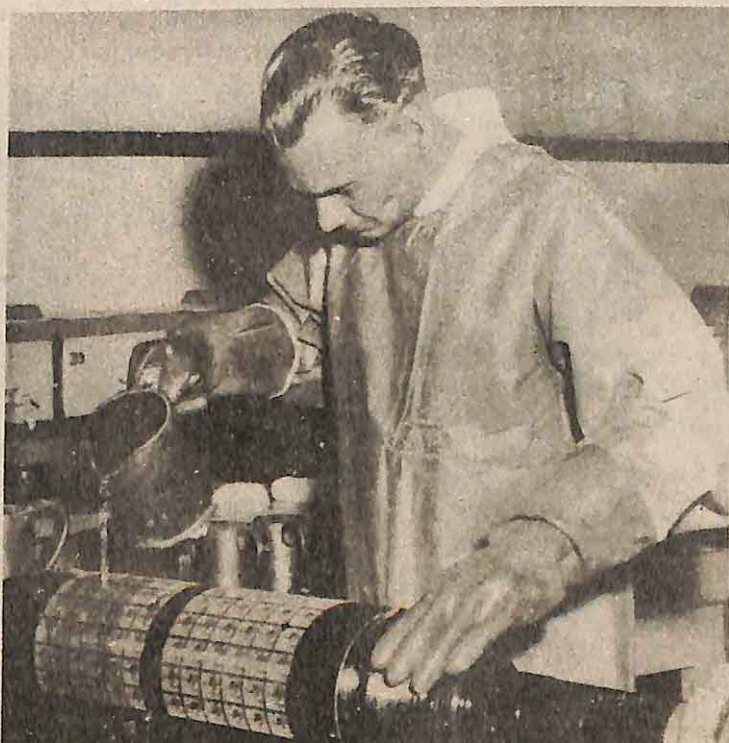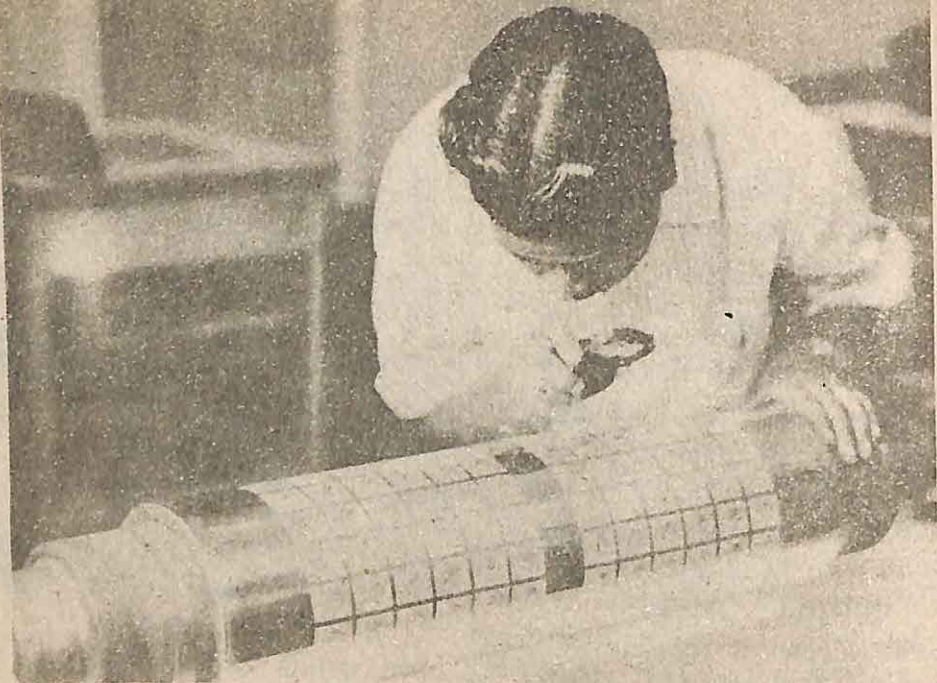
হয় না। নরম ইরেজারের মত ছাপার মেসিনেও একটা রবারের সিলেণ্ডার থাকে। দস্তা বা এ্যালুমিনিয়ম পাতে এইবার কালি লাগানো হয় 'ইঙ্ক' বা কালির রোলার দিয়ে। পাত থেকে ছাপটা উল্টোভাবে রবারের গায়ে উঠে আসে। যে কাগজটা ছাপতে হবে সেটা এবার রবারের গায়ে চেপে ধরা হয়। কাগজে ছাপটা এসে যায় সোজাভাবে। এইভাবে অফসেট লিথোগ্রাফীতে ছাপা হয়।

এনগ্রেভিং

এক টুকরো নরম কাঠ নাও। একদিক ভালো করে ঘষে সমান করো। তোমার পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে কাঠটা কেটে কেটে তোমার নামটা উল্টো করে কাঠের ওপর খোদাই করো। যেসব জায়গার কাঠ ছুরি দিয়ে কেটে উঠিয়ে ফেলেছো সেসব জায়গা নীচু হয়ে গেছে, অনেকটা ছোট ছোট গর্তের মতো। ঐ নীচু জায়গাগুলো কালি দিয়ে ভরাট করো। ভরাট করার সময় দেখবে উঁচু জায়গাগুলোতেও একটু-আধটু কালি লেগে গেছে। একটা ফর্সা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঐ জায়গাগুলো পরিষ্কার করে নাও। এবার একটা ব্লটিং-পেপার নিতে হবে। ব্লটিং-পেপার কালি শুষে নেয় তোমরা জানো। ঐ কাগজটা কাঠের ওপর লাগিয়ে জোরে চাপ দাও।

দেখবে কাগজে তোমার নাম সোজা হয়ে উঠে এসেছে। এনগ্রেভিং-এর সাহায্যে ছাপার পদ্ধতিটাও ঠিক এই রকম। একে ইনটাগলিও-ও বলে। ছাপাখানায় কিন্তু এইসব নক্সা খোদাই করে অভিজ্ঞ কুশলী কারিগররা। নক্সা খোদাই করার পর যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাগজের ওপর ছাপা হয়। এই ছাপার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ছাপা-কাগজের ওপর হাত বুলোলেই তুমি বুঝতে পারবে যে ছাপাগুলো কাগজ থেকে একটু উঁচু হয়ে আছে।

ফটোগ্রেভিওর

ফটোগ্রেভিওর পদ্ধতি অনেকটা এনগ্রেভিং-এর মতই। তফাৎ শুধু, নক্সাটা হাত দিয়ে খোদাই না-করে সূক্ষ্ম একটা স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে নক্সাটার ফটোগ্রাফ তুলে নেওয়া হয়। এই স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে ফটো তোলার দরুণ নক্সাটা ছোট ছোট বিন্দু দিয়ে তৈরী হয়ে যায়। এক কথায় ছোট ছোট বিন্দুর মধ্যে দিয়েই পুরো নক্সাটা দেখতে পাওয়া যায়। এবার ফিল্ম থেকে তামার পাতে এই বিন্দু দিয়ে তৈরী নক্সাটা তুলে নেওয়া হয়। এরপর এই বিন্দুগুলি হাতে খোদাই না করে 'কেমিক্যালের'র সাহায্যে খোদাই অর্থাৎ ছোট বড় গর্ত করে দেওয়া হয়। কোনটা অল্প কোনটা গভীর। 'এনগ্রেভিং'এর পদ্ধতির মত এবার কালি লাগালেই ঐ বিন্দুগুলো
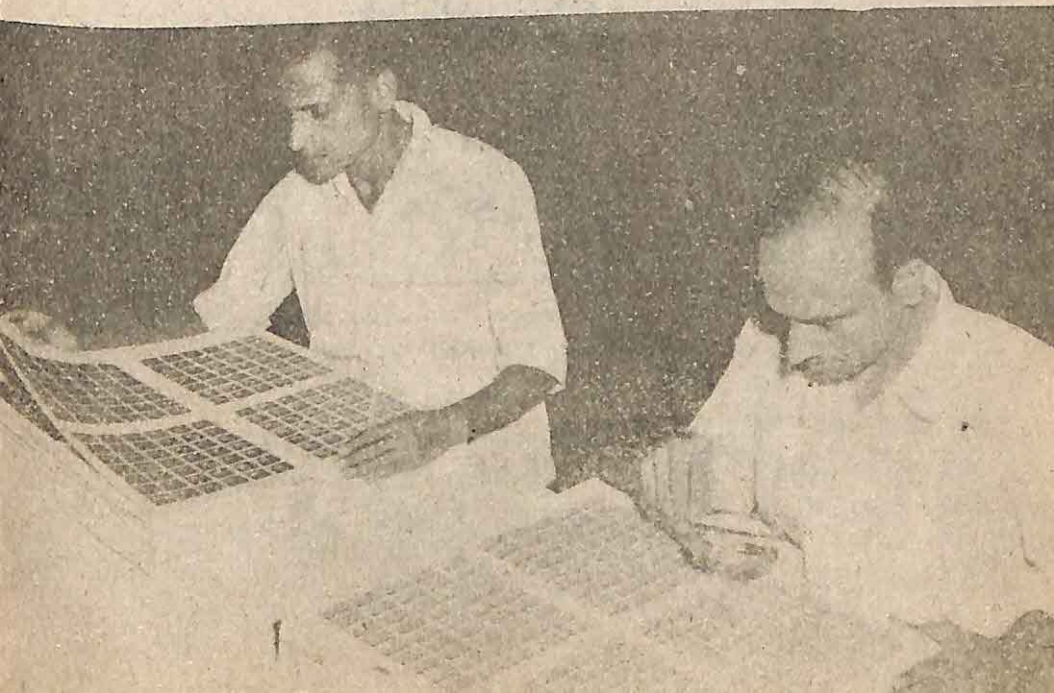
কালিতে ভরে যায়। আর এর থেকেই কাগজের ওপর ছাপা হয়। ১৯৫২ সাল থেকে এই পদ্ধতিতেই ভারতে ডাকটিকিট ছাপা হচ্ছে।

ছাপার পদ্ধতি তাই বহু ধরনের। প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধে আর উপযোগিতা আছে।

লেটারপ্রেসে এখনও ডাকটিকিট ছাপা হয়। একবার ছাপা হয়ে গেছে এমন ডাকটিকিটের ওপর আরো কিছু ছাপবার হলে লেটারপ্রেসে ছাপা হয়।

যখন ডাকটিকিট অনেকগুলো রঙে ছাপতে হবে তখন অফসেট লিথোগ্রাফীতেই ছাপা সুবিধে। নিখুঁত, সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছাপা এতে হয় না। কিন্তু অনেকগুলো রঙ একসঙ্গে ছাপা যায়, খরচও কম।

যে সমস্ত ডাকটিকিটের নক্সায় সূক্ষ্ম রেখা বা সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকে না সেসব ডাকটিকিট ফটোগ্রেভিওর সাহায্যে ভালোভাবে ছাপা যায়।

আজকের দিনে ডাকটিকিট ছাপার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। এনগ্রেভিং, ফটোগ্রেভিওর, লিথোগ্রাফী—এই সব কটা পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। যার ফলে খুব সুন্দর সুন্দর ডাকটিকিট নিখুঁতভাবে ছাপা অনেক সহজ হয়েছে।

ভুলত্রুটি

এইসব জটিল পদ্ধতিতে ডাকটিকিট ছাপতে গিয়ে অনেক সময়েই ছাপায় নানারকম ভুলত্রুটি থেকে যায়। বাজারে ছাড়ার আগে ডাকটিকিটগুলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। তবুও কিছু না কিছু ভুলভ্রান্তি নজর এড়িয়ে যায়। সাধারণত জিনিষ কেনার সময় আমরা খারাপ জিনিষ কিনি না। ভালো করে দেখেশুনে নিখুঁত জিনিষই কিনি। ডাকটিকিটের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উল্টো। যেসব ডাকটিকিটে ছাপার কিছু ভুলচুক রয়ে গেছে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীরা সেই ভুলত্রুটিযুক্ত ডাক টিকিটই খুঁজে বেড়ায়।

ডাকটিকিট ছাপার সময় নানারকমের ভুলভ্রান্তি হয়। তারমধ্যে কতকগুলো খুব সাধারণ, হামেশাই ঘটে।

নতুন করে নকসা তৈরী (ফ্রেস্ এন্ট্রি)

কখনও কখনও পাতার ওপর খোদাই-করা নক্সাটা তুলে ফেলতে হয়। নতুন করে আবার নক্সা কাটতে হয়। কেন, বলো তো? আগের নক্সাটা ঠিকমত খোদাই হয়নি বলেই। তুলে ফেলবার সময় আগেকার নক্সাটা যদি পুরো মুছে ফেলা না হয়, তবে খোদায়ের দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। দ্বিতীয়বার এর ওপর নক্সাটা কেটে ডাকটিকিট ছাপা হলে তাতেও ঐ আগেকার দাগগুলো এসে যায়। এই ত্রুটি যেসব ডাকটিকিটে থেকে যায় তাকে বলে 'ফ্রেস এন্টি' বা নতুন করে নক্সা তৈরী।

নক্সার মেরামতি (রি এন্ট্রি)

সংখ্যায় অনেক ডাকটিকিট ছাপার পর যখন নক্সার পাতটা ক্ষয়ে যায় বা ছাপার সময় কোনো কারণে যদি খোদাই-করা নক্সাটা ভোঁতা হয়ে যায় তখন তাকে মেরামত করে আবার ছাপার উপযোগী করে নেওয়া হয়।

এই ধরনের মেরামতের পর যে ডাকটিকিটগুলি ছাপা হয় তাদের 'রি এন্ট্রি' বলা হয়।

আরেকবার ঘষেমেজে নেওয়া (রি-টাচেস্)

লিথোগ্রাফীতে কিভাবে ছাপা হয় তা তোমরা এখন জানো। নক্সাটা কোনো পাথরে কিংবা তামার পাতে খোদাই করে নেওয়া হয়। সংখ্যায় অনেক ডাকটিকিট ছাপার পর এই খোদাই-করা নক্সার কোনো-না-কোনো অংশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। আর এটা প্রায়ই ঘটে। তখন ঐ ক্ষয়ে-যাওয়া অংশটুকু ঘষেমেজে ঠিক করে নেওয়া হয়। অনেক সময় ছাপা ডাকটিকিটে এই ঘষামাজার একটা দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। একেই বলা হয় 'রি-টাচেস্'।

উল্টো সোজা ছাপা (টেট্-বেস্)

ছাপার খরচ কমাতে অনেক ডাকটিকিট একসঙ্গে ছাপা হয়। কি করে ? ছাপবার মেসিনের সাইজের বরাবর পাথর কিংবা অন্য কোনো ধাতুর ওপর একই নক্সা অনেকগুলো খোদাই করে নেওয়া হয়। সোজা দিক আর উল্টো দিক বোঝানোর জন্যে ছাপার পাতে দাগমারা হয়। এই দাগ দিতে বা নক্সাগুলো পাথরের ওপর খোদাই করার সময় কখনও কখনও একটা-আধটা উল্টো খোদাই হয়ে যায়। ছাপা কাগজ থেকে ডাকটিকিট-গুলো যদি একটা একটা করে ছিঁড়ে আলাদা করে নেওয়া হয় তবে কোনো তফাৎ বোঝা যাবে না। কিন্তু এক জোড়া ডাকটিকিটের একটায় যদি উল্টো-ছাপা আর অন্যটায় সোজা করে ছাপা থাকে তাহলেই ছাপার ভুলটা আমাদের চোখে পড়বে। এই ধরনের ভুল সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তবুও হয়। একেই বলে 'টেট্-বেস্'।

দুবার ছাপা (ডাবল্স)

বহু রকমের 'জোড়' আছে। ছাপার সময় একটা কাগজ যদি ছাপার মেসিনের ভেতর দিয়ে দুবার যায় তাহলে নক্সাটার ছাপও কাগজে দুবার পড়বে। প্রথমবারের ছাপের ওপর দ্বিতীয়বারের ছাপটা সমানভাবে যদি

পড়ে তাহলে ছাপার ত্রুটি কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু একটু নড়েচড়ে গেলেই তা বোঝা যাবে। যত বেশি নড়েচড়ে যাবে ততই ছাপার ত্রুটিটা বেশি করে চোখে পড়বে।

কখনও কখনও একটা কাগজের ছুটো পিঠই ছাপা হয়ে যায়। সামনের দিকটা সোজা ছাপা হয় আর পেছনের দিকটা উল্টো। ভুল হিসেবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাকটিকিট যারা জোগাড় করে বেড়ায় তারা এই ধরনের ডাকটিকিটের খোঁজে থাকে। তোমার এ্যালবামের পাতায় এই ধরনের ডাকটিকিট যদি একটাও থাকে তবে তোমার সংগ্রহ অমূল্য হয়ে দাঁড়াবে।

ডাকটিকিটে একের বেশি রঙ্ থাকলে কাগজটাকেও একবারের বেশি ছাপতে হয়। যতগুলো রঙ্ ততবার ছাপতে হয়। প্রত্যেকটি রঙের ছাপা ঠিকমত হওয়া চাই। চুলচেরা তফাৎ হলেই ছাপা অন্যরকম দেখাবে। একটু নড়েচড়ে গেলেই ছাপা-কাগজের নক্সাটা মনে হবে আলাদা। এই ধরনের ছাপায় গরমিল-ওলা ডাকটিকিট সংগ্রাহকের কাছে সত্যিই এক ছুর্লভ জিনিষ।

চুম্বন (কিস্)

কখনও কখনও ছাপা হয়ে যাবার পর ছাপা কাগজটিকে সরিয়ে নেবার সময় এটা আবার পাতটায় ঠেকে যায়। ফলে কোনো টিকিটের গায়ে দ্বিতীয়বার একটু-আধটু ছাপ পড়ে যায়। আসলে এটা কিন্তু ছুবার ছাপা হয়নি। এই ধরনের ছাপার ভুলকে 'কিস্' বা চুম্বন বলে।

রঙ্ নিখোঁজ (কালার মিসিং)

আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় রঙে ছাপার সময় ছুটো কাগজ

একই সঙ্গে ছাপার মেসিনের মধ্যে চলে যায়। ফলে নীচেকার কাগজটিতে একটা রঙের ছাপ পড়ে না। ডাকটিকিট ছাপায় এমনতরো ভুল সংগ্রহ-কারীরা খুঁজে ফেরে।

উল্টো ছাপা (ইন্‌ভারটেড)

অনেক সময় ডাকটিকিটের চারধার বা ফ্রেমটা এক রঙে ও মাঝখানটা বা আসল নক্সাটা অন্য রঙে ছাপা হয়। প্রথমে শুধু ফ্রেমটা এক রঙে ছেপে নেওয়া হয় তারপর আসল নক্সাটা। এক রঙে ফ্রেমটা ছাপার পর দ্বিতীয় রঙটা ছাপার সময় মেসিনে কাগজটা যদি উল্টোভাবে লাগানো হয় তাহলে মধ্যিখানের আসল নক্সাটাও উল্টো ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। এই ধরনের ভুল ছাপাকে 'ইনৃভারটেড' বা উল্টো ছাপা বলা হয়।

রঙের তারতম্য

অনেক সময় কালি-মেশানোর দোষে একই রঙের ছাপায় ইতর-বিশেষ খুব বেশি চোখে পড়ে। প্রথম দিকের ছাপা ডাকটিকিটেই এই ধরনের রঙের তারতম্য বেশি ঘটতো।

ছাপায় দোষ

ছাপার সময় যদি কাগজে ভাঁজ থাকে কিংবা ভাঁজের দাগ পড়ে যায়, তাহলে ছাপার পর ভাঁজের দরুন একটু সাদা জায়গা ছাপা-ডাকটিকিটের মধ্যে থেকে যায়। কখনও বা নক্সাটির কোনো অংশ এইভাবে ছাপায় বাদ পড়ে যায়। এদেরই বলা হয় 'ছাপায় দোষ' কিংবা 'ছাপার খামখেয়ালী'।

এইরকম বিভিন্ন ধরনের ভুল ছাপা ডাকটিকিট জোগাড় করতে পারলে ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারটা আরও মজাদার হয়ে ওঠে। তাই ডাক-টিকিট জোগাড় করার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ডাকটিকিটে এই ধরনের ভুলত্রুটি খুঁজে বার করে সেগুলো সংগ্রহ করতে হয়। ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক ছাড়াও ভুলত্রুটি-ভরা ডাকটিকিট সংগ্রহকেও মূল্যবান করে তোলে। সারা দুনিয়ার সংগ্রাহকেরা এই ধরনের ডাকটিকিট জোগাড় করার দিকে কড়া নজর রাখে। হাত বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এইসব ডাক-টিকিটের দামও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

যেসব ভুলত্রুটির কথা এতক্ষণ বললাম, এসবই কিন্তু ছাপার ভুল।

কাজেই ছাপায় ভুলচুক থেকে গেছে কিনা তা দেখার জন্যে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে। ছাপার এই সব ভুলত্রুটিই এক একটা ডাকটিকিটকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। উল্টো ছাপার তিনটে নমুনা থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ডাকটিকিট জোগাড় করবার সময় তোমাদের কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডাকটিকিট দেখতে হবে।

ভারতের সবচেয়ে নামকরা ডাকটিকিটগুলোর মধ্যে 'ভারতীয় চার আনা উল্টো ছাপা ছবি' মার্কা ডাকটিকিটটাই বিখ্যাত। প্রথম দিকে সারা ভারতে যেসব ডাকটিকিট চালু করা হয়েছিলো এটি তাদেরই একটি। সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস থেকে ১৮৫৪ সালে এটি লিথোগ্রাফী পদ্ধতিতে ছাপা হয়। এই সিরিজের শুধু চার আনা ডাকটিকিট দু রঙে ছাপা হয়। বাকী সবই এক রঙা। ডাকটিকিটগুলোর চারধার আর মধ্যেকার নক্সা আলাদা আলাদা করে ছাপা হয়। ছাপার সময় ভেতরকার নক্সাটা উল্টো ছাপা হয়ে যায়। ছাপার এই ভুল কিন্তু ১৮৭৪ অবধি ধরা পড়েনি। 'ভারতীয় চার আনা উল্টো ছাপা ছবি'র প্রায় চব্বিশটি ডাকটিকিট এখনও পাওয়া যায়। প্রত্যেকটির দাম এক হাজার চারশো পাউণ্ড অর্থাৎ পঁচিশ হাজার দুশো টাকারও বেশি।

ডাকটিকিট ছাপায় ঠিক এই ধরনের ভুল হয়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৬৯ সালে। এক, দুই, তিন, ছয়, দশ, বারো, পনেরো, চব্বিশ ও নব্বই সেণ্ট দামের দশ রকমের ডাকটিকিট বাজারে ছাড়া হয়। অল্প দামের টিকিটগুলো এক রঙে ছাপা। বেশি দামের চার রকমের ডাকটিকিট ছাপা

হয় তু রঙে। বিক্রি সুরু হোলো। সরকারী এজেণ্ট মারফৎ ডাকটিকিট বিক্রি হোত। বিক্রির জন্যে যে সব ডাকটিকিট দেওয়া হয়েছিলো তারমধ্যে পনেরো সেণ্ট দামের ডাকটিকিটের একটা পুরো পাতার মাঝখানের নক্সাটা উল্টো ছাপা। নক্সাটিতে ছিলো : কলম্বাস জাহাজ থেকে নামছেন। পরে চব্বিশ ও তিরিশ সেণ্ট দামের ডাকটিকিটেও এই ধরনের ছাপার ভুল ধরা পড়ে। এই উল্টোছাপা ব্যবহার-না-করা আটটি ডাক-টিকিটের কথা আমরা জানি। এর মধ্যে পনেরো সেণ্ট দামের ডাকটিকিটটাই সবচেয়ে দামী। দাম ষোলো হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ তু লক্ষ অষ্টআশী

চব্বিশ সেণ্ট দামের বিমানডাক ডাকটিকিটের মধ্যের ছাপা উল্টো

হাজার টাকা। দামের দিক থেকে এর পরই নাম করা যায় তিরিশ সেণ্টের ডাকটিকিটটির। এর প্রত্যেকটির দাম সাত হাজার পাঁচশো পাউণ্ড অর্থাৎ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। উল্টো ছাপা চব্বিশ সেণ্টের ডাকটিকিটের দাম ছ হাজার পাঁচশো পাউণ্ড বা এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকা।

তোমাদের মধ্যে যারা সবেমাত্র ডাকটিকিট সংগ্রহ সুরু করেছো, ডাকটিকিট যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখো তবে এই ধরনের মওকা হারাবে। ডাকটিকিট সব সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যেমনভাবে দেখতেন মিষ্টার ডবলু. টি. রোবে। তিনিই সবপ্রথম চব্বিশ সেণ্ট বিমানডাক উল্টো ছাপা ডাকটিকিটটা লক্ষ্য করেন। ১৯১৮ সালের ১৩ই মে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র একটা নতুন চব্বিশ সেণ্ট দামের বিমানডাক টিকিট চালু করে। ডাকটিকিটটার নক্সা ছিলো একটা উড়ন্ত বিমান, ছাপা দু রঙে। ওয়াশিংটনের একজন উৎসাহী ডাকটিকিট সংগ্রহকারী মিষ্টার ডবলু. টি. রোবে কাছাকাছি এক ডাকঘর থেকে নতুন ডাকটিকিটের একটা পুরো পাতা কিনেই অবাক হয়ে দেখেন যে টিকিটের মাঝখানকার উড়োজাহাজটি উল্টে রয়েছে। তাঁর ডাকটিকিটের পুরো পাতাটা আজও এক সুদুর্লভ বস্তু হয়ে আছে। এক হপ্তা পরে তিনি এটা বিক্রি করে দিলেন পনেরো হাজার ডলারে অর্থাৎ এক লক্ষ দশ হাজার টাকায়। পরে আবার হাত বদল হোলো বিশ হাজার ডলারে বা এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকায়। কিনে নিলেন কর্নেল গ্রীন বলে এক ভদ্রলোক। তিনিই এই ডাকটিকিটগুলো নানাভাবে ভাগ করে নিলেন। একসঙ্গে চারটে, কিংবা শুধু একটা করে। ১৯৪০ সালে একটা ডাকটিকিট বিক্রি হয় চার হাজার একশো ডলারে বা ত্রিশ হাজার দুশো টাকায়।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করা কত উত্তেজনার ব্যাপার তা এ থেকেই বুঝতে পারছো। মওকা লাভও হতে পারে এ থেকে। তোমার সংগ্রহের কোনো একটা টিকিট যে কোনো একদিন অমূল্য হয়ে উঠতে পারে। ডাকটিকিট সংগ্রহ থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারো, বহু দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারো। এই শখ কত রোমাঞ্চকর, না? অবসর সময় কাটাবার কি সুন্দরই না উপায়। এতে আনন্দ আছে আর আছে জ্ঞান আহরণের অপূর্ব সুযোগ। তোমার কাছে তোমার এই এ্যালবাম সাধারণ জ্ঞান ও তথ্যের একটা ছোটোখাটো এনসাইক্লোপিডিয়া।

В.Ф. БЫКОВСКИЙ

25
DDR

MOCAMBIQUE

GUINEE
40F

40F

1863 - 1963
MAGYAR POSTA

4D

FLOTA MAMBISA
10c
CORREOS DE CUBA

150

60
MAGYAR POSTA

ČESKOSLOVENSKO
30h

ডাকটিকিট সংক্রান্ত পরিভাষা

অ্যাডিহীসিভ : ডাকটিকিটের পেছনে আঠা লাগান থাকলে তাকে অ্যাডিহীসিভ বলা হয়। এতে জল-হাত দিয়ে যে কোনো জায়গায় ডাকটিকিটটা এঁটে দেওয়া যায়।

এ্যালবিনো : ছাপা ডাকটিকিটের কোনো অংশে ছাপার দাগ-না-পড়া। খোদাই-করা ডাকটিকিটের বেলাতেই বেশী দেখা যায়।

বাইসেক্টস্ : ডাকটিকিটকে সমান দু-ভাগে ভাগ করা। সাধারণত কোনাকুনিভাবে ভাগ করা হয়। একটা চার আনা দামের ডাকটিকিট কেটে দু আনার ডাকটিকিট হিসেবে খামের ওপর লাগিয়ে ব্যবহার করা। অনেক সময় অনেক দেশে জরুরী অবস্থায় এই ধরনের ডাকটিকিট ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশপ্ মার্ক : ১৬৬১ সালে হেন্‌রী বিশপের প্রবর্তিত নামকরা হাতেমারা গোল শীলমোহর।

ব্লক অফ স্ট্যাম্পস্ : চার বা তার বেশি ডাকটিকিটের গোছা যা একসঙ্গে জোড়া থাকে। ডাকটিকিটের লম্বা ফালি নয়।

ক্যাচেট : বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাকটিকিটের ওপর ডাকঘরের যে শীলমোহর মারা হয়। এর সাহায্যে বোঝানো হয় যে ডাকটিকিটটা ব্যবহার করা হয়ে গেছে। যেমন ধরো ডাকটিকিট বের হওয়ার প্রথম দিনের লেফাপা, কোনো বিশেষ অভিযান উপলক্ষ্যে কিংবা কোনো বিশেষ ধরনের বিমান চলাচল উপলক্ষ্যে ডাকঘরের শীলমোহর।

ক্যান্‌সেলেশন : ডাকটিকিটের ওপর ডাকঘর যে ছাপ মেরে দেয়। এই ছাপ মেরে বোঝানো হয় যে ডাকটিকিটটা ব্যবহার করা হয়ে গেছে। ডাকঘরের মোহরের ছাপ কিংবা কলম দিয়ে কাটার দাগও হতে পারে। 'নমুনা' এই ধরনের কথা লেখা ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে বা কোনো যন্ত্রের সাহায্যে ডাকটিকিটের ওপর ছোট ছোট ফুটো করে দেওয়া হয়।

সেণ্টার্ড : ডাকটিকিটের মধ্যিখানের নক্সাটা যখন ফ্রেমের চারদিক থেকে সমান দূরে থাকে। এই দূরত্বের কম বেশি হলেই সেই ডাকটিকিট অমূল্য জিনিষ হয়ে ওঠে।

কয়ল্ ষ্ট্যাম্প : মেসিনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে-আসা ডাকটিকিট যা একটা একটা করে ছিঁড়ে নেওয়া হয়। সাধারণত ডাকঘরের বাইরে বিক্রি করা হয়। এগুলো সমানভাবে জড়ানো থাকে। জলছাপটি থাকে পাশের দিকে। একে রোলও বলা হয়।

কম্বিনেশন কাভার : যখন একের অধিক দেশের ডাকটিকিট একটা লেফাফার ওপর দেখা যায়।

কাভার : খাম বা লেফাফা যাতে ডাকটিকিট লাগানো থাকে।

ডেফিনিটিভ্ ইশিউস্ : একটা দেশে যেসব সাধারণ ডাকটিকিট ছেপে বাজারে ছাড়া হয়। এর ব্যতিক্রম হোলো স্মারক-ডাকটিকিট বা

সাহায্যার্থে বিশেষ ডাকটিকিট।

ডাই : খোদাই-করা ধাতুর আসল অংশটি। কখনও কখনও একে আসল ছাঁচও বলা হয়। ছাপার আগে প্লেট বা পাতের ওপর এরই সাহায্যে ছাপ তুলে নেওয়া হয়।

এনটায়ার্ : পুরো খাম, পোস্টকার্ড বা লেফাফা যাতে ডাকটিকিট লাগানো থাকে।

এরার্ : চলতি ডাকটিকিটের কোনো একটাতে যখন কোনো ভুলত্রুটি থাকে।

এসেজ : ডাকটিকিটের জন্যে পাঠানো নক্সা যা বাতিল করা হয়।

ফার্স্ট-ডে-কভার : নতুন ডাকটিকিট চালু হওয়ার প্রথম দিনে ডাকঘরের মোহর করা ডাকটিকিট-লাগানো খাম।

ফিস্ক্যাল্ : ডাকমাশুল ছাড়া অন্য কর আদায়ের জন্যে যে টিকিট ব্যবহার করা হয়।

ইম্পারফোরেট : যে ডাকটিকিটের চারধারে ফুটো থাকে না। পাতা থেকে যা কেটে নিতে হয়।

ইনভার্টেড্ : অনেক সময় ছাপা ডাকটিকিটের নক্সার অংশবিশেষ উল্টো-ভাবে ছাপা থাকে। যেমন, রাজার মাথা অথবা ডাকটিকিটের দাম।

কিলার্ : ডাকঘরের শীলমোহর যখন মোটা করে ডাকটিকিটের ওপর মারা হয় তখনই এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়।

মিনিয়েচার শিট : বিশেষভাবে ছাপা ডাকটিকিটের একটা পাতা বা শিট। কখনও কখনও স্মারকচিহ্ন হিসেবে এতে একটা ডাকটিকিট থাকে।

মিণ্ট্ : ব্যবহার না-করা আঠা লাগানো একটা ডাকটিকিট।

মালরেডি : ১৮৪০ সালে গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম আগাম মাশুল দেওয়া খাম। উইলিয়ম মালরেডি এর নক্সা তৈরী করেছিলেন।

ওভারপ্রিণ্ট্ : প্রথম দফায় ছাপার পর ডাকটিকিটের ওপর আবার ছাপা।

পারফরেশন্ : পানচিং মেসিনের সাহায্যে ডাকটিকিটের ধারগুলো ফুটো ফুটো করে দেওয়া হয়। এতে দুটো ডাকটিকিটের মাঝখানে ছোট ছোট গোল ফুটো তৈরী হয়। অনায়াসেই দুটো ডাকটিকিটকে তাই সহজেই ছেঁড়া যায়। দু সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে কতগুলো ফুটো আছে তা গুনে প্রতিটি ফুটো কত বড় তা মাপা হয়। তাই পার্ফ সাড়ে বারো, পার্ফ পনেরো বলতে বোঝায় যে ঐ মাপের জায়গায় কতগুলো করে ফুটো আছে।

ফিল্যাটেলিক্ বিউরো : একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, সব দেশের সরকারই এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। ডাক-ঘরের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের কাজ-কারবার ডাকটিকিট যাঁরা সংগ্রহ করেন তাদের নিয়ে।

প্লেট নাম্বারস্ : কোনো কোনো দেশের ছাপা ডাকটিকিটের ধারে ধারে নম্বর ছাপা থাকে। এটা খোদাই-করা যে পাত থেকে ছাপা হয়েছে তার ক্রমিক সংখ্যাই নির্দেশ করে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ সালের

মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে যত ডাকটিকিট বেরিয়েছে তার সবেতেই এই ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে। এছাড়াও অনেক ডাকটিকিটেই এই ক্রমিক সংখ্যা ছাপা থাকে।

পোস্টাল হিস্টরি : চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের একেবারে গোড়া থেকে সুরু করে সারা দুনিয়ার ডাক ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস। ডাকবিভাগের ইতিহাসের ছাত্র, ডাকটিকিট সংগ্রাহক নাও হ'তে পারে।

পোস্টাল স্টেশনারী : খাম, পোষ্টকার্ড এবং লেফাফা যাতে ডাকটিকিট ছাপা বা খোদাই করা থাকে।

কোয়াড্রিল : জলছাপ অথবা আড়া-আড়ি রেখায় ভরা কাগজ যাতে ছোট ছোট চৌখুপ্পী আছে।

রাউলেট্ : ছোট ছোট ফুটো করে দুটো ডাকটিকিটকে আলাদা করার পদ্ধতি থেকে এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ডাকটিকিট আলাদা করার এটি আর একটি পদ্ধতি। কাগজের ওপর শুধু কাটার দাগ দিয়ে দেওয়া হয়।

সে-টেন্যান্ট : দুখানা ডাকটিকিট ভিন্ন ভিন্ন নক্সার বা বিভিন্ন রঙের হয়েও একসঙ্গে জোড়া থাকলে এই শব্দ ব্যবহার করে তাদের বোঝানো হয়।

টেট্-বেস্ : দুখানা ডাকটিকিট যখন একসঙ্গে জোড়া থাকে আর তার একটা উল্টো ছাপা থাকে।

ভীনিয়েট্ : ডাকটিকিটের মধ্যিখানের আসল নক্সা বা ডিজাইন।

ওয়াটার মার্ক্ : কাগজ তৈরীর সময় কাগজের গায়ে যে জল ছাপ দেওয়া হয়।

প্রতিটি দেশ ও তার ডাকবিভাগ প্রথম কবে ডাকটিকিট চালু করেছে তা জানতে সত্যিই কৌতূহল জাগে। সংগ্রহকারীদের সুবিধের জন্যে নীচে তা দেওয়া হোলো :

১৮৪০ গ্রেট ব্রিটেন
১৮৪৩ ব্রেজিল, জেনেভা, জুরিখ
১৮৪৫ ব্যাসেল, যুক্তরাষ্ট্র (পোষ্টমাষ্টার দ্বারা)
১৮৪৭ মরিসাস্, যুক্তরাষ্ট্র (সরকারীভাবে), ত্রিনিদাদ
১৮৪৮ বারমুণ্ডা
১৮৪৯ ব্যাভেরিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স
১৮৫০ অস্ট্রিয়া, ব্রিটিশ গায়ানা, হ্যানোভার, নিউ সাউথ ওয়েলস্, প্রুসিয়া, স্যাক্সনি, শ্লেষউইগহোলষ্টিন, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া
১৮৫১ ব্যাডেন, কানাডা, ডেনমার্ক, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, নিউ ব্রানস্উইক, সারডিনিয়া, টাসকেনি, উরটেম্বার্গ
১৮৫২ বারবাডোস, ব্রান্স্উইক, দি নেদারল্যাণ্ডস্, ভারতবর্ষ, লাক্সেমবুর্গ, মোডেনা, ওলডেনবার্গ, পারমা, রিইউনিয়ন, রোমান ষ্টেট্স্, থার্ন এবং ট্যাক্সিস
১৮৫৩ উত্তমাশা অন্তরীপ, চিলি, নোভা স্কোটিয়া, পর্তুগাল, টাসমানিয়া

১৮৫৪ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া

১৮৫৫ ব্রেমেন, করিয়েন্টেস্, কিউবা এবং পোর্টোরিকো, ডেনমার্ক অধিকৃত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন

১৮৫৬ ফিনল্যাণ্ড, মেকলেনবার্গ, সোয়েরিন, মেক্সিকো, সেণ্ট হেলেনা, উরুগুয়ে

১৮৫৭ সিলোন, নাটাল, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, পেরু

১৮৫৮ আর্জেন্টাইন রিপাব্লিক, রোয়েনস্ আয়ারস্, করডোবা, নেপল্স্, মলডাভিয়া, পেরু, রাশিয়া

১৮৫৯ বাহামাস্, কলম্বিয়া রিপাব্লিক, ফরাসী উপনিবেশসমূহ, হামবুর্গ, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, লুবেক, রোমাগ্না, সিসিলি, ভেনেজুয়েলা, সিয়েরা লিওন

১৮৬০ জ্যামাইকা, লাইবেরিয়া, মাল্টা, নিউ ক্যালিডনিয়া, কুইন্স্ল্যাণ্ড, সেণ্ট লুসিয়া, পোল্যাণ্ড, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং ভ্যানকোভার দ্বীপ

১৮৬১ বারগেডর্ফ, কনফিডারেট ষ্টেট্স্, গ্রীস, গ্রেনাডা, নিয়াপলিটান প্রভিন্সেস্, নেভিস্, প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, সেণ্ট ভিনসেণ্ট, ফক দ্বীপপুঞ্জ

১৮৬২ এ্যান্টিগুয়া, হংকং, ইতালি (রাজ্য), নিকারাগুয়া

১৮৬৩ বলিভা, তুরস্ক সাম্রাজ্য (রুশ ডাকঘরসমূহ), কষ্টারিকা, তুরস্ক, ওয়েনডেন

১৮৬৪ ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, হোলষ্টিন, মেকলেনবার্গ-ষ্ট্রেলিজ, সোরাথ শ্লেষউইগ

১৮৬৫ ডোমিনিকান রিপাব্লিক, ইকোয়াডর, রুমানিয়া, সাংহাই

১৮৬৬ বলিভিয়া, ব্রিটিশ হণ্ডুরাস, মিশর, হণ্ডুরাস, জম্মু ও কাশ্মীর, সারবিয়া, ভারজিন্ দ্বীপপুঞ্জ

১৮৬৭ চায়াপাশ, গুয়াদালাজারা, হেলিগোল্যাণ্ড, তুরস্ক সাম্রাজ্য (অষ্ট্রিয়ান ডাকঘরসমূহ), সালভাডর, ষ্ট্রেটস্ সেটল্মেণ্টস্, টার্কস্ দ্বীপপুঞ্জ

১৮৬৮ এ্যান্টিকুইয়া, আজোরস্, ফার্নাণ্ডো পু, ম্যাডিরা, উত্তর জার্মাণী রাজ্যপুঞ্জ, অরেঞ্জ রিভার উপনিবেশ (ও. এফ. এস), পারস্য

১৮৬৯ গাম্বিয়া, হায়দ্রাবাদ, সারাউইক, ট্রান্সভাল (এস্.এ.আর)

১৮৭০ আফগানিস্থান, আলসেস্ লরেন, এ্যাঙ্গোলা, কাণ্ডিনামার্কা, ফিজি, প্যারাগুয়ে, সেণ্ট ক্রিষ্টোফার, টোলিমা, সেণ্ট টমাস এবং প্রিন্স দ্বীপপুঞ্জ

১৮৭১ গুয়াতেমালা, হাঙ্গেরী, জাপান

১৮৭২ জার্মাণী

১৮৭৩ কিউবা, কিউরাকো, আইস-

ল্যাণ্ড, পোর্টোরিকো (স্পেন অধিকৃত), সুরিনাম

১৮৭৪ ডোমিনিকা, গ্রিকোয়াল্যাণ্ড, জিন্দ, লাগোস, মন্টেনেগরো, তুরস্ক সাম্রাজ্য (ইতালীয় ডাকঘরসমূহ)

১৮৭৫ গোল্ড কোষ্ট

১৮৭৬ ভূপাল, মণ্ট্সেরাট, পুঞ্চ, জোহোর, ক্যাম্পেচে, মোজাম্বিক্

১৮৭৭ আলওয়ার, ভার্ড অন্তরীপ, নয়ানগর, সামোয়া, সান ম্যারাইনো

১৮৭৮ হণ্ডুরাস চীন, পানামা, পেরাক, সুঙ্গেয়ী উজং

১৮৭৯ ভোর, বোসনিয়া এবং হার-জেগোভিনিয়া, বুলগেরিয়া, কাউকা, ফরিদকোট, লাবু-য়ান, সিরমুর, টোবাগো

১৮৮০ সাইপ্রাস, পূর্ব রৌমেলিয়া, রাজপিপলা

১৮৮১ হাইতি, নেপাল, পর্তুগীজ গিনি, সেলাঙ্গর

১৮৮২ ব্যাঙ্কক (ব্রিটিশ ডাকঘর-সমূহ), তাহিতি

১৮৮৩ উত্তর বোর্ণিও, শ্যামদেশ

১৮৮৪ গুয়াদেলুপে, মাকাও, মাদা-গাস্কার (বি. সি. এন), পাতিয়ালা, সান্তানদের, ষ্টেলাল্যাণ্ড, তুরস্ক সাম্রাজ্য (জার্মাণ ডাকঘরসমূহ), কোরিয়া

১৮৮৫ গুয়ানাকাস্তে, গোয়ালিয়র, মোনাকো, নাভা, সেণ্ট পিয়ের এবং মিকোয়েলন, দক্ষিণ বুলগেরিয়া, তুরস্ক সাম্রাজ্য (ব্রিটিশ ডাকঘর-সমূহ), তুরস্ক সাম্রাজ্য (ফরাসী ডাকঘরসমূহ) বেচুয়ানাল্যাণ্ড

১৮৮৬ চাম্বা, কোচিন, বেলজিয়ান কঙ্গো, ফরাসী গায়ানা, গ্যাবুন জিব্রাল্টার, মার্টিনিক্, নিউ রিপাব্লিক দক্ষিণ আফ্রিকা, টোঙ্গা, ইন্দোর, টিমোর

১৮৮৭ ঝালওয়ার, সেনেগাল

১৮৮৮ আন্নাম এবং টোন্কুইন, ত্রিবাঙ্কুর, টিউনিসিয়া, ওয়াধ-ওয়ান, জুলুল্যাণ্ড, বামরা

১৮৮৯ ফরাসী মাদাগাস্কার, ইন্দো-চীন, নোসিবে, সোয়াজি-ল্যাণ্ড, পাহাঙ্

১৮৯০ ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা (রোডে-সিয়া), ডিয়েগো-সুয়ারেজ, লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, সেই-কেলেস্

১৮৯১ ফরাসী কঙ্গো, মরোক্কো (ফরাসী ডাকঘরসমূহ), নেগরী সেমবিলান, নিয়াসাল্যাণ্ড প্রোটেক্টরেট (বি. সি. এ), টিয়েরা দ্য ফিউগল

১৮৯২ আঙ্রা, আন্জোয়ান, বেনিন, কোচিন, কুক দ্বীপ-পুঞ্জ, ফরাসী গিনি, ফানচাল, হোর্তা, আইভরি কোষ্ট, মেয়োট, মোজাম্বিক কোং, নাইগার কোষ্ট (অয়েল

রিভারস্), ওবোক, ওশিয়্যানিক সেটল্মেন্টস্, পোন্টা ডেল্গাডা, রাজনন্দগাঁও

১৮৯৩ চুভিয়া, ইরিত্রিয়া, টাঙ্গানাইকা (জি. ই. এ), জিবাউটি

১৮৯৪ আবিসিনিয়া, বুন্দি, চারখারি (ডাকঘরসমূহ), ফরাসী সুদান, লোরেঞ্জো মার্কোয়েস, ষ্টে মারী ডু মাদাগাস্কার, জাম্বেসিয়া, জাঞ্জিবার (ফরাসী ডাকঘরসমূহ), পর্তুগীজ কঙ্গো

১৮৯৫ ইনহামবেন, বুসাহির, উগাণ্ডা, জাঞ্জিবার (ব্রিটিশ)

১৮৯৬ হোণ্ডা, তুরস্ক সাম্রাজ্য (রুমানিয়ান ডাকঘরসমূহ), মাদাগাস্কার (ফরাসী ডাকঘরসমূহ)

১৮৯৭ ক্যামেরুন্স্, চীন (জার্মাণ ডাকঘরসমূহ), ধার্, জার্মাণ, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, গ্র্যাণ্ড কোমোরো, লাস বেলা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, নিয়াসা, সুদান, টোগো

১৮৯৮ ক্রীট্ (ব্রিটিশ ডাকঘরসমূহ), মরোক্কো (ব্রিটিশ ডাকঘরসমূহ), পর্তুগীজ আফ্রিকা, থেস্যালি, জার্মাণ নিউ গিনি

১৮৯৯ বয়াকা, ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ, দাহোমে, মিশর (ফরাসী ডাকঘরসমূহ), গুয়াম, কিষেণগড়, মরোক্কো (জার্মাণ ডাকঘরসমূহ), কিউবা

১৯০০ ক্রীট্, চীন (জাপানী ডাকঘরসমূহ), কোরিয়া (জাপানী ডাকঘরসমূহ), ক্রীট্ (ইতালীয় ডাকঘরসমূহ), সম্মিলিত মালয় রাজ্য, জার্মাণী অধিকৃত সামোয়া, কিয়াউট সেট, ম্যারিয়েন দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর নাইজিরিয়া, টার্কস্ এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ

১৯০১ মাগডালেনা, পাপুয়া (বি. এন. জি), দক্ষিণ নাইজিরিয়া, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, সাইরেনাইকা

১৯০২ ক্রীট্ (ফরাসী ডাকঘরসমূহ), ফরাসী সোমালি উপকূল, নিউই, পেন্‌রিন্ দ্বীপপুঞ্জ, স্পেন অধিকৃত গিনি

১৯০৩ আইতুতাকি, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, ক্রীট্ (অষ্ট্রিয়ান ডাকঘরসমূহ), পূর্ব আফ্রিকা এবং উগাণ্ডা, এলোবে, এ্যানোবন এবং কোরিস্কো, সোমালিয়া, মরোক্কো (স্পেনীয় ডাকঘরসমূহ), সেন্ট কিট্স্-নেভিস, সেনেগাম্বিয়া এবং নাইগার

১৯০৪ জয়পুর, পানামা ক্যানেলজোন্

১৯০৫ রায়ো ডি ওরো

১৯০৬ ব্রূনে, মালডিভ্ দ্বীপপুঞ্জ, মরিটানিয়া, মোহেলি, সেনেগাল-এর উচ্চতর এলাকা এবং নাইগার

১৯০৭ ব্রিটিশ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কঙ্গোর মধ্য এলাকা

১৯০৮ নিউ হেব্রাইডিজ
১৯১০ ট্রেন্‌গানু, ত্রিপোলিতানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত রাষ্ট্র
১৯১১ গিলবার্ট ও এলিস্‌ দ্বীপপুঞ্জ, কেলানটান্‌, তিব্বত (চীনা ডাকঘরসমূহ)
১৯১২ কেডা, লাইচ্‌টেনষ্টাইন, তিব্বত এবং এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ
১৯১৩ আলবানিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ওরছা, ত্রিনিদাদ, টোবাগো
১৯১৪ নিউ গিনি, নাইজিরিয়া
১৯১৬ জুরি অন্তরীপ, নাউরু, ঔবাঙগুই চারি, রুয়ান্দা-উরুন্দি, সৌদি এ্যারেবিয়া
১৯১৮ চেকোশ্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, ফিউমে, ল্যাটভিয়া, ইরাক্‌, লিথুয়ানিয়া, প্যালেস্তাইন, ইউক্রেন্‌, যুগোশ্লাভিয়া
১৯১৯ বাতুম, জর্জিয়া, সাংহাই (যুক্তরাষ্ট্রীয় ডাকঘরসমূহ), সিরিয়া
১৯২০ মধ্য লিথুয়ানিয়া, ডানজিগ্‌, আর্মেনিয়া, সাইলেসিয়া, ইঙ্গারম্যান ল্যাণ্ড, জোডান, মেমেল, সার, ভোল্টার উপরের এলাকা, ওয়ালিস্‌ এবং ফুটুনা দ্বীপপুঞ্জ
১৯২১ বারওয়ানি, নাইগার, টোগো
১৯২২ এ্যাসেনসন, বারবুডা, আয়ারল্যাণ্ড, চাড
১৯২৩ কুয়ায়েট, লীগ অফ নেশন্‌স্‌, ট্রান্সককেশিয়ান ফেডারেশন
১৯২৪ আলজিরিয়া, লেবানন, মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ রোডেসিয়া, স্পেন অধিকৃত সাহারা
১৯২৫ এ্যালাওউইটিজ্‌, জুবাল্যাণ্ড, উত্তর রোডেসিয়া
১৯২৬ উত্তর মঙ্গোলিয়া (তান্নু তৌভা), ইয়েমেন
১৯২৮ এ্যাণ্ডোরা
১৯২৯ ভ্যাটিকান সিটি
১৯৩১ মোরৃভি
১৯৩২ ইনিনি, মাঞ্চুরিয়া
১৯৩৩ বাহ্‌রেন, বাসুতোল্যাণ্ড
১৯৩৫ বিজাওয়ার
১৯৩৭ এডেন, বার্মা
১৯৩৮ গ্রীণল্যাণ্ড, হেতে, ইতালীয় পূর্ব-আফ্রিকা
১৯৩৯ ইডার, শ্লোভাকিয়া
১৯৪০ ফারো দ্বীপপুঞ্জ, পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ
১৯৪১ চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, ক্রোয়াশিয়া, ইফনি
১৯৪২ জাস্‌দান, শিহ্‌র্‌ এবং মুকুল্লা
১৯৪৪ ক্যাম্পিয়নি, ফকল্যাণ্ড দ্বীপের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ, মুস্কাট, শ্লোভেনিয়া
১৯৪৫ ভেনেজিয়া গিউলিয়া এবং ইস্ত্রিয়া, ফরমোসা, ইন্দোনেশীয় গণরাজ্য, ভিয়েৎনাম
১৯৪৬ ফিজ্জান, চীন (পিপল্‌স্‌ রিপাব্লিক), উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম
১৯৪৭ নরফোক দ্বীপ, পাকিস্তান, ত্রিয়েস্তে
১৯৪৮ বাহাওয়ালপুর, ইস্রায়েল,

মাল্লাক্কা, পেনাঙ্, পারলিস্ রুউকু দ্বীপপুঞ্জ, তোকেলো দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম বার্লিন
১৯৪৯ রাজস্থান, পূর্ব জার্মাণী, পশ্চিম জার্মাণী
১৯৫০ কোমোরো দ্বীপপুঞ্জ নেদারল্যাণ্ডস্, নিউ গিনি
১৯৫১ কাম্বোডিয়া, গালাপাগোস্ দ্বীপপুঞ্জ, লাওস্, লিবিয়া, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ
১৯৫২ পাপুয়া এবং নিউ গিনি, ট্রিষ্টান ডা কুন্হা
১৯৫৪ রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড
১৯৫৬ টিউনিসিয়া
১৯৫৭ কুয়াটার, টোগো (স্বশাসিত গণরাজ্য)
১৯৫৮ ক্রিস্‌মাস দ্বীপ, মালাগাসি গণরাজ্য
১৯৫৯ উচ্চতর ভোল্টা গণরাজ্য, গিনি (গণতন্ত্র), মধ্য আফ্রিকার গণতন্ত্র, কঙ্গো গণরাজ্য, আইভরি উপকূল গণরাজ্য
১৯৬০ কঙ্গো, ক্যামারুনস্, রায়ো মুনি, দাহোমে গণরাজ্য, মালি, মরিটানিয়া
১৯৬১ ট্রসিয়াল ষ্টেট্স্
১৯৬২ ভুটান, বুরুন্দি, রোয়ান্দা, পশ্চিম নিউ গিনি
১৯৬৩ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আরব মিলিত রাজ্য, দুবাই, কেনিয়া, শারজাহ্ এবং তার অধীনস্থ রাজ্যসমূহ
১৯৬৪ পূর্ব আফ্রিকা, আজমান, ফুজেইরা, আবু ধাবি, রাস-আল-খাইমা, জাম্বিয়া, মালওয়াই
১৯৬৬ মানামা, বাহ্‌রেন
১৯৬৭ এ্যাঙ্গুইলা